# বাঙালী জীবনের নৃতাত্ত্বিক রূপ

ডঃ অতুল সুর

# বাঙালী জীবনের নৃতাত্ত্বিক রূপ

# লেখক পরিচিতি

ডঃ অতুল সুর অর্থনীতিতে D.Sc.। ইতিহাস ও নৃতত্ত্বে এম.এ.। প্রথম শ্রেণীতে প্রথম ও সুবর্ণপদক প্রাপ্ত। দশ বছরের ওপর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিট্যুট অফ সোস্যাল ওয়েলফেয়ার অ্যাণ্ড বিজনেস্ ম্যানেজমেন্ট-এ ফলিত অর্থনীতির অধ্যাপনা করেছেন। ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিট্যুট অফ ম্যানেজমেন্ট-এ অতিথি অধ্যাপক হিসাবে কাজ করেছেন। ৩৪ বৎসর কলিকাতা স্টক এক্সচেঞ্জ অ্যাসোসিয়েশন-এর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা নিযুক্ত ছিলেন। ১৯৪৬ সাল থেকে ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড' ও 'বিজনেস স্ট্যাণ্ডার্ড' পত্রিকার বানিজ্য সম্পাদক ছিলেন। রয়েল ইকনমিক সোসাইটি ও রয়েল স্ট্যাটিসটিক্যাল সোসাইটির ফেলো। মৌলিক অর্থনৈতিক গবেষণার জন্য ১৯৮২ খৃষ্টাব্দে Critics Circle of India হতে CCI Award পেয়েছেন। সামাজিক ও অর্থনৈতিক সাহিত্য রচনার জন্য 'কলা সংস্কৃতি পরিষদ' কর্তৃক পুরস্কৃত হয়েছেন। ৮৮ বৎসর কাল বয়সের মধ্যে ইংরেজি, বাংলা ও হিন্দিতে দশ হাজারের ওপর প্রবন্ধলিখেছেন। ওঁর রচিত গ্রন্থ সংখ্যা ১৫২। 'সৃজনশীল সাহিত্য কৃতি'র জন্য নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন থেকে বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার' 'সুশীলাদেবী বিড়লা স্মৃতি পুরস্কার পেয়েছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বিশিষ্ট সদস্য বা 'ফেলো'। ওঁর Challenge of Rural Poverty বইখানা পড়ে অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী ড. গুণার মিরডাল বলেছেন—'আপনার অর্থনৈতিক দুরদর্শিতা অত্যাশ্চর্য'।

# বাঙালী জীবনের নৃতাত্ত্বিক রূপ

ডঃ অতুল সুর



বেস্টবুকস্

১এ কলেজ রো, কলিকাতা—৭০০০০৯

Bangali Jivaner Nritatwik Rup
By Dr. Atul Sur

প্রথম প্রকাশ ঃ জানুয়ারী ১৯৯২


ISBN : 81-85252-45-9



প্রকাশক
বেস্টবুকস্
প্রকাশন বিভাগ
১এ কলেজ রো, কলিকাতা–৭০০০০৯

টাইপ কম্পোজিশন্
টাইপোস ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড
৬২/১ হিন্দুস্থান পার্ক, কলিকাতা ৭০০ ০২৯

মুদ্রাকর
মিত্র প্রেস
৮১ বি পটলডাঙ্গা স্ট্রীট
কলিকাতা – ৭০০ ০০৯

মূল্য ঃ ২৫ টাকা

## নিবেদন

১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু মহাসভার সভাপতি ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও সম্পাদক বিজয়কুমার গাঙ্গুলি মহোদয়দ্বয়ের অনুরোধে আমি হিন্দু মহাসভার মুখপত্র 'হিন্দুস্থান' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে 'বাঙ্গালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়' সংজ্ঞক এক নিবন্ধ লিখি। পরে ১৯৭৭ খ্রীস্টাব্দে 'জিজ্ঞাসা' প্রকাশন সংস্থার কর্ণধার শ্রীশ কুমার কুণ্ড মহাশয় বইখানি তাঁর 'বিচিত্র বিদ্যা গ্রন্থমালা'র অর্ন্তভুক্ত করেন। বইখানি বাঙালী পাঠক সমাজে বিপুল সমাদর লাভ করে। বইখানি মূলতঃ আবয়বিক নৃতত্ত্ব বা physical anthropology-র বই। বইখানি প্রকাশের পর থেকে আমি পাঠক সমাজের কাছ থেকে অনবরত অনুরোধ পেয়েছি, ওই বইখানির পরিপূরক হিসাবে আমি বাঙালী জীবনের নৃতাত্ত্বিক পরিচয় বা cultural anthropology-র একখানা বই লিখি। বর্তমান গ্রন্থখানি সেই অনুরোধের ফল। প্রথম বইখানির সহিত সমান মাত্রা রাখবার জন্য বইখানি যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে লেখা হয়েছে। 'বেস্টবুক্‌স্' প্রকাশন সংস্থার স্বত্বাধিকারী শ্রী শ্রীবিন্দু ভট্টাচার্য বইখানি প্রকাশের ভার নিয়ে আমার কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

অতুল সুর

৩-বি নেবুবাগান বাই লেন,
কলিকাতা—৩।
মকর সংক্রান্তি ১৩৯৮।

# সূচী

# প্রাগৈতিহাসিক প্রেক্ষাপট

বাঙালীর জীবন শুরু হয়েছিল মানুষের আবির্ভাবের দিন থেকে। ভূতাত্ত্বিক আলোড়ন ও চঞ্চলতার ফলে বাঙলা দেশ গঠিত হয়ে গিয়েছিল প্লাওসিন যুগে। ভূতত্ত্ববিদগণের হিসাব অনুযায়ী সেটা ঘটেছিল প্রায় দশ থেকে পঁচিশ লক্ষ বৎসর পূর্বে। তখন থেকেই আবির্ভূত হয়েছিল মানুষের পূর্বপুরুষ – উপ-নর। তারপর বিবর্তনের পথে আজ থেকে পাঁচ লক্ষ বৎসর পূর্বে ঋজুভাবে চলাফেরা করতে পারে এরূপ মানুষের আবির্ভাব ঘটে। এর পরবর্তী পর্যায়ের মানুষের নাম দেওয়া হয়েছে নিয়ানডারথাল জাতির মানুষ। আনুমানিক চল্লিশ হাজার বৎসর পূর্বে নিয়ানডারথাল জাতির মানুষ পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায়। তার স্থান অধিকার করে ক্রোম্যানিয়োন (Cromagnon) জাতির মানুষ। ক্রোম্যানিয়োন জাতির মানুষ থেকেই পৃথিবীর বর্তমান জাতিসমূহের উদ্ভব ঘটেছে। এক কথায়, পৃথিবীতে বর্তমানে যত জাতি বিদ্যমান আছে, তারা সকলে একই বর্গ (genus) ও প্রজাতি (species) হতে উদ্ভূত। তাদের মধ্যে যে-সকল বৈশিষ্ট্যমূলক পার্থক্য আছে, তার জন্য তাদের বিভিন্ন নরগোষ্ঠীর (races) লোক বলা হয়। বিভিন্ন নরগোষ্ঠীর মধ্যে পর্যায়গত যে সব পার্থক্য ঘটেছে, তার হেতু (১) gene mutation বা জীনঘটিত পরিব্যক্তি, (২) natural selection বা প্রাকৃতিক নির্বাচন, (৩) genetic drift বা জীনের নিস্ক্রিয়তা, (৪) environmental influence বা পরিবেশের প্রভাব, ও (৫) population mixture বা জনমিশ্রণ।

॥ দুই॥

আবির্ভাবের দিন থেকেই মানুষের প্রধান সমস্যা ছিল আত্মরক্ষা ও খাদ্য আহরণ। যে যুগে মানুষের প্রথম আবির্ভাব ঘটেছিল, সে-যুগে সে চতুর্দিকে পরিবেষ্টিত ছিল অতিকায় হস্তী (mammoth), বন্য মহিষ (bison) ও অন্যান্য হিংস্র জন্তু দ্বারা; আর তার খাদ্য ছিল বন্য ফলমূল ও পশুমাংস। মাংসই ছিল তার প্রধান খাদ্য। তবে যারা নদীর ধারে বাস করত, মনে হয় তারা মাছও খেত। পশু শিকার ও আত্মরক্ষার জন্য সে যুগের মানুষকে আয়ুধ তৈরি করতে হত। ভারতে এগুলো তৈরি করা হত নদীর ধারে পাওয়া নুড়ি (pebbles) ও কোয়ার্টজাইট পাথর (quartzite) দিয়ে।

এভাবে মানুষকে তার জীবনের প্রথম অধ্যায়ে ৪৯০,০০০ বৎসর কাটাতে হয়েছিল। তার জীবনের এই প্রথম অধ্যায়টাকে আমরা প্রত্নোপলীয় যুগ বলি। কেননা এ যুগের মানুষ মাত্র পাথর দিয়েই তার আয়ুধ ও অন্যান্য আবশ্যকীয় জিনিস তৈরি করত। এই দীর্ঘকালের মধ্যে মানুষ কৃষির উদ্ভব ঘটাতে পারেনি এবং কোনরূপ ধাতুর ব্যবহারও জানত না। আয়ুধ নির্মাণ ছাড়া, প্রত্নোপলীয় যুগের মানুষের আরও কতকগুলি বৈশিষ্ট্য ছিল, যথা ভাবপ্রকাশের জন্য ভাষার ব্যবহার, পরিবার গঠন, পশু শিকার সুগম করবার জন্য পর্বতগুহায় বা পর্বতগাত্রে চিত্রাঙ্কন দ্বারা ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়ার আশ্রয় গ্রহণ ও আগুণের ব্যবহার। যে সকল বৈশিষ্ট্যমূলক আয়ুধ প্রত্নোপলীয় যুগের মানুষ তৈরি করত তার অন্তর্ভূক্ত ছিল হাত-কুঠার (hand axes), মাংস কাটবার অস্ত্র (choppers), মাংস ছেদন করবার আয়ুধ (cleavers) ইত্যাদি। তবে সে যাযাবরের জীবন যাপন করত। কেননা, শিকারের নিমিত্ত পশু সংখ্যা এক জায়গায় হ্রাস পেলে, তাকে স্থানান্তরে সরে যেতে হত।

প্রত্নোপলীয় যুগের আয়ুধ সমূহ আমরা বাঙলার নানাস্থান থেকে পেয়েছি। সেই সকল স্থানের অন্তর্ভূক্ত হচ্ছে– মেদিনীপুর জেলার অরগণ্ডা, সিলদা, অষ্টজুরি, শহারি, ভগবন্ধ, ঝাড়গ্রাম, কুকরাধুপি, গিডনি, ও চিকলিগড়; বাঁকুড়া জেলার কাল্লা লালবাজার, মনোহর, বন আসুরিয়া, শহরজোরা, কাঁকরাদারা, বাউরিডাঙ্গা, শুশুনিয়া, ও শিলাবতী নদীর

প্রশাখা জয়পান্ডা নদীর অববাহিকা; বর্ধমান জেলার গোপালপুর, সাতখনিয়া, বিলগভা, সাগরডাঙ্গা, আরা ও খুরুপির জঙ্গল; ও কুমিল্লার লালমাই পাহাড়ে। অন্তিম প্রত্নোপলীয় যুগের আয়ুধসমূহ বিশেষ করে পাওয়া গিয়েছে দামোদর নদীর উপত্যকায় অবস্থিত বীরভনপুরে, ও বর্ধমান ও মেদিনীপুর জেলার নানাস্থানে। অন্তিম প্রত্নোপলীয় যুগের মানুষ হয় নদীর ধারে, আর তা নয়তো পাহাড়ের ওপরে বা পাহাড়ের ছাউনির (rock shelters) মধ্যে মাটির ঘর তৈরি করে বাস করত। এসব জায়গায় কোন কোন স্থানে আয়ুধ নির্মাণের কারখানাও পাওয়া গিয়েছে। তা থেকে বুঝতে পারা যায় যে, সে-যুগের মানুষ সম্পূর্ণভাবে যাযাবরের জীবন যাপন করত না। তার মানে; এ-যুগের মানুষ সমাজবদ্ধ হবার চেষ্টা করছিল।

॥ তিন ॥

এই স্থায়ী বসতিস্থাপনের প্রবণতা নবোপলীয় যুগেই বিশেষভাবে প্রকটিত হয়। নবোপলীয় যুগের মানুষ পশুপালন ও কৃষির উপযোগী স্থানেই বসতি স্থাপন করত। কৃষির উদ্ভব কিভাবে ঘটেছিল, সেটা এখানে বলতে চাই। ভূমিকর্ষণের সূচনা করেছিল মেয়েরা। পশু শিকারে বেরিয়ে পুরুষের যখন ফিরতে দেরি হত, তখন মেয়েরা ক্ষুধার তাড়নায় গাছের ফল এবং ফলাভাবে বন্য অবস্থায় উৎপন্ন খাদ্যশস্য খেয়ে প্রাণধারণ করত। তারপর তাদের ভাবনা-চিন্তায় স্থান পায় এক কল্পনা। সন্তান উৎপাদনের প্রক্রিয়া তাদের জানাই ছিল। যেহেতু ভূমি বন্য অবস্থায় শস্য উৎপাদন করে, সেই হেতু তারা ভূমিকে মাতৃরূপে কল্পনা করে নেয়। যুক্তির আশ্রয় নিয়ে তারা ভাবতে থাকে, পুরুষ যদি নারীরূপ ভূমি (পরবর্তীকালে আমাদের সমস্ত ধর্মশাস্ত্রেই মেয়েদের 'ক্ষেত্র' বা 'ভূমি' বলে বর্ণনা করা হয়েছে) কর্ষণ করে সন্তান উৎপাদন করতে পারে তবে মাতৃরূপী পৃথিবীকে কর্ষণ করে শস্য উৎপাদন করা যাবে না কেন? তখন তারা পুরুষের লিঙ্গস্বরূপ এক যষ্টি বানিয়ে তা দিয়ে ভূমিকর্ষণ করতে থাকে। (Przyluski তাঁর 'Non-Aryan Loans in Indo-Aryan' প্রবন্ধে দেখিয়েছেন যে

'লিঙ্গ', 'লাঙ্গুল' ও 'লাঙ্গল'– এই তিনটি শব্দ একই ধাতুরূপ থেকে উৎপন্ন)। মেয়েরা এইভাবে ভূমিকর্ষণ করে শস্য উৎপাদন করল। পুরুষরা তা দেখে অবাক হল। তারা লক্ষ্য করল লিঙ্গরূপী যষ্টি হচ্ছে passive, আর ভূমিরূপী পৃথিবী ও তাদের মেয়েরা হচ্ছে active। Active মানেই শক্তির আধার। ফসল তোলার পর প্রথম যে 'নবান্ন' উৎসব হল, সেই উৎসবেই জন্ম নিল লিঙ্গপূজা ও ভূমিরূপী পৃথিবীর পূজা। (অতুল সুর, 'হিন্দু সভ্যতার নৃতাত্ত্বিক ভাষ্য',দ্রষ্টব্য)। লিঙ্গপূজার সূচনা যে নবোপলীয় যুগেই হয়েছিল সে সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা পাওয়া যাবে আমার 'Beginnings of Linga Cult in India' (Annals of the Bhandarkar Oriental Institute 1929) প্রবন্ধে।

নবোপলীয় যুগেই মানুষ প্রথম কৃষি, পশুপালন, বয়ন, মৃৎপাত্র নির্মাণ ও স্থায়ী বসবাস শুরু করেছিল। নবপলীয় যুগের বৈশিষ্ট্যমূলক আয়ুধ ছিল মসৃণ পরশু। এরূপ পরশু আমরা পেয়েছি বাঁকুড়া জেলার বন আসুরিয়া, কচিণ্ডা, শুশুনিয়া ও জয়পাণ্ডায়; মেদিনীপুর জেলার অরগণ্ডা, কুকরাধুপি, তারাফেনি, দুলুঙ নদীর মোহনায়, কংসাবতী নদীর অববাহিকায়, কাঁকরাদাড়া, তমলুক, তামাজুরি, চাতলা ও আগাইবানি থেকে। দক্ষিণে চব্বিশ পরগণার হরিনারায়ণপুর, ও উত্তরে দার্জিলিঙ জেলার কালিমপঙ থেকেও আমরা প্রচুর পরিমাণে এরূপ পরশু পেয়েছি। সুতরাং প্রত্নোপলীয় যুগ থেকে নবোপলীয় যুগের বিবর্তন যে বাঙলাদেশে স্বাভাবিকভাবেহ ঘটেছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না।

## ॥ চার ॥

বস্তুতঃ নবোপলীয় যুগের উন্মেষ ও প্রাদুর্ভাব পূর্বভারতেই ঘটেছিল। এ সম্পর্কে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, কিছুদিন আগে পর্যন্ত পণ্ডিতমহল মনে করতেন যে মধ্য-প্রাচীর জারমো, জেরিকো ও কাটাল হুয়ুক নামক স্থান সমূহেই নবোপলীয় সভ্যতার প্রথম উন্মেষ ঘটে, এবং তা বিকশিত হয়ে ক্রমশ ইরানীয় অধিত্যকা ও মধ্য এশিয়ার দিকে অগ্রসর হয়। কিন্তু পরবর্তী আবিষ্কারের ফলে জানা গিয়েছে যে, এরও আগে

নবোপলীয় সভ্যতার প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল থাইল্যাণ্ডে। এ সভ্যতার বিশদ বিবরণ দিয়েছেন রোনালড্ শিলার।

সি. ও. সয়ারও তাঁর 'এগ্রিকালচারেল অরিজিনস্ অ্যাণ্ড ডিসপারসেল' গ্রন্থে বলেছেন যে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াই নবোপলীয় বিপ্লবের প্রাচীন লীলাভূমি ছিল বলে মনে হয়। প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ কারলটন এস. কুন. তাঁর 'হিস্ট্রি অভ্ ম্যান' গ্রন্থের ১৪৫ পৃষ্ঠায় 'নবোপলীয় সভ্যতার উন্মেষ ও বিকাশ'-এর যে মাণচিত্র দিয়েছেন তাতেও তিনি নবোপলীয় সভ্যতার উৎপত্তি সম্বন্ধে পূর্ব-ভারতে এক স্বতন্ত্র উৎপত্তি-কেন্দ্র দেখিয়েছেন। কারলো চিপোলোও (Carlo Cipollo) তাঁর 'দ্য ইকনমিক হিস্ট্রি অভ্ ওয়ারলভ্ পপুলেশন' গ্রন্থে নানা তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে দেখিয়েছেন যে 'বঙ্গোপসাগরের আশপাশের মৌসুমী বায়ুপ্রবাহ অঞ্চলেই স্বাধীনভাবে ভূমিকর্ষণ ও পশুপালনের সূচনা হয়েছিল।'

প্রত্নোপলীয় যুগের মানুষের মত নবোপলীয় যুগের মানুষেরাও ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়ার আশ্রয় নিত ও মৃতব্যক্তির সমাধির ওপর একখানা লম্বা পাথর খাড়াভাবে পুঁতে দিত। এরূপ ঋজুভাবে প্রোথিত পাথর আমরা পশ্চিমবঙ্গের যে-সব জায়গায় পেয়েছি, তার একটা বিবরণ দিচ্ছি। বাঁকুড়া শহর থেকে দশ মাইল পশ্চিমে ছাতনায় এক পুকুরের কাছে এরূপ ঋজুভাবে প্রোথিত স্মৃতিফলক আমরা দেখতে পাই। এগুলি চার-পাঁচ ফুট উঁচু এবং এগুলির গায়ে অপরিণত শৈলীর ক্ষোদিত মূর্তি আছে। এগুলি সম্বন্ধে নানারূপ জনশ্রুতি বিদ্যমান। তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, যে-সকল সাহসী বীর সৈনিক যুদ্ধে নিহত হতেন, এগুলি তাদেরই সমাধির ওপর প্রোথিত। মেদিনীপুরের কিয়াৱাচাঁদ গ্রামেও এরূপ ঋজুভাবে প্রোথিত বহু প্রস্তরফলক দেখতে পাওয়া যায়। এ-গুলির বর্ণনায় বলা হয়েছে –'Rounded at the top, they seemed to have been deliberately chiselled and stand on the open field as rigid and uncommunicative sentinels which they certainly are, continuing to baffle historians as to how they originated'.

এরূপ ঋজুভাবে প্রোথিত প্রস্তরফলক বাঁকুড়া জেলার ছাতনার দু-মাইল দূরে মৌলবনায়, ও হুগলি জেলাতেও

পাওয়া গিয়েছে। হুগলি জেলায় এগুলিকে 'বীরকাঁড়' বলা হয়। মনে হয় এগুলি অনু-অস্ট্রেলিয় বা প্রোটো-অস্ট্রালয়েড জাতির অবদান। কেননা, দক্ষিণ ভারতের আদিবাসীদের মধ্যেও আমরা অনুরূপ ঋজুভাবে প্রোথিত প্রস্তরফলক দেখি। নীলগিরি পাহাড়ের অধিবাসী কুড়ুম্বা উপজাতির লোকেরা এরূপ প্রস্তরফলককে 'বীরকল্লু' নামে অভিহিত করে ও এগুলির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে। কুড়ুম্বা ও ইরুলা উপজাতিদের ভাষায় এর অর্থ হচ্ছে 'বীরপুরুষের স্মৃতিফলক'। এক কথায়, এগুলি সমাধির ওপর স্থাপিত স্মৃতিফলক। সমাধির ওপর স্থাপিত এরূপ স্মৃতিফলক ছোটনাগপুরের হো ও মুণ্ডা জাতির গ্রামেও ড্যালটন (Dalton) দেখেছিলেন। নীলগিরি পাহাড়ের কুড়ুম্বাদের মত ছোটনাগপুরের হো ও মুণ্ডারাও এগুলির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে। মনে হয়, বাঙলাদেশে মানুষের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের পর গ্রামের বাইরে যে বৃষকাষ্ঠ প্রোথিত করা হয়, সেগুলি এরূপ প্রস্তরফলকেরই কাষ্ঠ-নির্মিত উত্তর-সংস্করণ। (A. K. Sur, 'History and Culture of Bengal', 1963 pages 20-21 ও 'বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন' পৃষ্ঠা ৫৭-৫৮ দ্রঃ)।

বস্তুত নবোপলীয় যুগের অনেক কিছুই আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ধরে রেখেছি; যথা ধামা, চুবড়ি, কুলা, ঝাঁপি, বাটনা বাটবার শিল-নোড়া ও শস্য পেশাইয়ের জন্য জাঁতা ইত্যাদি। তাছাড়া বর্তমান শতাব্দীর গোড়া পর্যন্ত আমরা আমাদের গৃহস্থালিতে (জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতেও সেই প্রথা ছিল) পাথরের থালা, গেলাস, বাটি ইত্যাদি ব্যবহার করতাম। এগুলি সবই নবোপোলীয় যুগের 'টেকনোলজি' অনুযায়ী (যদিও লৌহনির্মিত যন্ত্রের সাহায্যে) তৈরি হত।

## ॥ পাঁচ ॥

নবোপলীয় যুগের পরেই তাম্রাশ্ম যুগের অভ্যুত্থান লক্ষ্য করা যায়। তাম্রাশ্ম সভ্যতার অভ্যুদয়ে তামাই প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। মিশর, সুমের, সিন্ধু উপত্যকা সর্বত্রই আমরা সভ্যতার প্রথম প্রভাতে তামার ব্যবহার দেখি। সুতরাং

সহজেই অনুমান করতে পারা যায় যে, তাম্রাশ্ম সভ্যতার উন্মেষ এমন কোন জায়গায় হয়েছিল, যেখানে তামা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেত। এখানে-সেখানে তামা অবশ্য সামান্য কিছু কিছু পাওয়া যেত, কিন্তু তা নগণ্য। বাঙলাই ছিল সে-যুগের তামার প্রধান উৎস ও আড়ত। তামার বৃহত্তম খনি ছিল বাঙলা দেশে। বাঙলার বণিকরাই 'সাত সমুদ্দুর তের নদী' পার হয়ে, ওই তামা নিয়ে যেত সভ্যতার বিভিন্ন কেন্দ্রসমূহে বিপণনের জন্য। এজন্যই বাঙলার বড় বন্দরের নাম ছিল 'তাম্রলিপ্ত'। এই তামা সংগৃহীত হত ধলভূমে অবস্থিত তৎকালীন ভারতের বৃহত্তম তাম্রখনি থেকে।

বাঙলায় যে এক বিশাল তাম্রাশ্ম সভ্যতার অভ্যুদয় ঘটেছিল, তা আমরা খণ্ড খণ্ড আবিষ্কারের ফলে জানতে পারি। ১৯৭৬ খ্রীস্টাব্দে মেদিনীপুর জেলার গড়বেতা থানার অন্তর্গত আগাইবানিতে ৪০ ফুট গভীর মাটির তলা থেকে আমরা পেয়েছি তামার একখানা সম্পূর্ণ পরশু ও অপর একখানা প্রমাণ আকারের পরশুর ভাঙা মাথা, ছোট আকারের আর একখানা পরশু, এগারোখানা তামার বালা এবং খানকতক ক্ষুদ্রকায় তামার চাঙারি। পুরাতাত্ত্বিক দেবকুমার চক্রবর্তীর মতে, এগুলি হরপ্পার (সিন্ধু সভ্যতার) পূর্ববর্তী বা সমসাময়িক কোন মানবগোষ্ঠীর। ১৮৮০ খ্রীস্টাব্দে মেদিনীপুরের বিনপুর থানার অন্তর্গত তামাজুড়ি গ্রামে তাম্র-প্রস্তর যুগের অনুরূপ নিদর্শন-সমূহ পাওয়া গিয়েছিল। ১৯৬৫ খ্রীস্টাব্দে ওই জেলারই এগরা থানার চাতলা গ্রামে ওই ধরনের আরও কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়। ১৯৬৮ খ্রীস্টাব্দে পার্শ্ববর্তী জেলা পুরুলিয়ার কুলগড়া থানার হাড়া গ্রামেও কিছ কিছু ওই ধরনের নিদর্শন পাওয়া যায়। অনুরূপ পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন আজ থেকে ত্রিশ বছর পূর্বে মধ্যপ্রদেশের রেওয়া জেলার পাণ্ডিগাঁয়েও পাওয়া গিয়েছিল। তার অন্তর্ভূক্ত ছিল আগাইবানির ধরনের ৪৭ টি তামার বালা ও পরশু। এ থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, তাম্রাশ্ম সভ্যতার পরিযান (migration) পূর্বদিক থেকে পশ্চিম দিকে ঘটেছিল।

এসব নিদর্শন থেকে বুঝতে পারা যায় যে, সুদুর অতীতে পুরুলিয়া-বাঁকুড়া-বর্ধমান-মেদিনীপুর অঞ্চল জুড়ে এক সমৃদ্ধশালী তাম্রাশ্ম সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। খণ্ড খণ্ড আবিষ্কারের ফলে আমরা সেই লুপ্ত সভ্যতার মাত্র সামান্য কিছ

আভাস পাই। আজ যদি আমরা সিন্ধু সভ্যতার কেন্দ্রসমূহ যথা হরপ্পা, মহেঞ্জোদারো, লোথাল, কালিবঙ্গান প্রভৃতি স্থানের ন্যায় বাঙলায় প্রণালীবদ্ধ-ভাবে রীতিমত খননকার্য চালাই, তা হলে আমরা নিশ্চয়ই জানতে পারব যে, তাম্রাশ্ম সভ্যতার উন্মেষ বাঙলাদেশেই ঘটেছিল এবং বাঙলাদেশই সভ্যতার অন্যতম জন্মভূমি ছিল।

॥ ছয় ॥

বাঙলায় তাম্রাশ্ম সভ্যতার সবচেয়ে বড় নির্দশন পাওয়া গিয়েছে বর্ধমান জেলার অজয় নদীর তীরে অবস্থিত পাণ্ডুরাজার ঢিবি থেকে। মহিষদল, মঙ্গলকোট, ও অজয়, কুন্নুর ও কোপাই নদীর উপত্যকার অন্যত্রও আমরা এই সভ্যতার নিদর্শন পাই। উৎখননের ফলে পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে আমরা চারটি স্তরের সন্ধান পেয়েছি। পাণ্ডুরাজার ঢিবির দ্বিতীয় যুগের লোকরাই তাম্রাশ্ম সভ্যতার ধারক ছিল। তারা সুপরিকল্পিত নগর ও রাস্তাঘাট তৈরি করত। তারা গৃহ ও দুর্গ– এই উভয়ই নির্মান করতে জানত। কৃষি ও বৈদেশিক বাণিজ্য তাদের অর্থনীতির প্রধান সহায়ক ছিল। তারা ধান্য ও শস্য উৎপাদন করত এবং পশুপালন (বিশেষ করে শুকর) ও কুলালের কাজও জানত। শিমুল তুলা দিয়ে তারা সুক্ষ্ম বস্ত্রও বয়ন করত। পূর্ব-পশ্চিম দিকে শয়ন করিয়ে তারা মৃতব্যক্তিকে সমাধিস্থ করত এবং মাতৃকাদেবীর পূজা করত।

মহেঞ্জোদারো, হরপ্পা প্রভৃতি নগরে মাতৃদেবীর পূজার যে ব্যাপক প্রচলন ছিল তা মৃন্ময়ী মাতৃকাদেবীর মূর্তি সমূহ থেকে প্রকাশ পায়। মনে হয় বাঙলা দেশ থেকেই তা ওখানে গিয়েছিল, কেননা, বাঙলাই মাতৃদেবীর পূজার লীলা কেন্দ্র ছিল। আগেই বলেছি যে মাতৃদেবীর পূজার উদ্ভব নবোপলীয় যুগে কৃষির সূচনার সঙ্গে ঘটেছিল। বাঙলায় নবোপলীয় বিপ্লবের সূচনা হয়েছিল ধান্যের চাষ নিয়ে। মনে হয়, ধান্যের চাষের সঙ্গে মাতৃদেবীর পূজা বাঙলাতেই শুরু হয়েছিল। ধান্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হচ্ছেন লক্ষ্মী। লক্ষ্মীপূজার অপর নাম খন্দপূজা। খন্দ শব্দের আভিধানিক অর্থ চচ্ছে ফসলাদি। লক্ষ্মীপূজা যে অতি প্রাচীনকাল থেকেই অনুসৃত হয়ে আসছে,

তা লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে ব্যবহৃত দ্রব্যাদি থেকেই প্রকাশ পায়।

হিন্দুধর্মে শিব ও শক্তি যে মাত্র নরাকারে পূজিত হন, তা নয়; লিঙ্গ ও যোনি হিসাবেও পূজিত হন। এই দুইয়ের সংমিশ্রণেই তন্ত্র ধর্মের উদ্ভব হয়েছিল। একত্রিত লিঙ্গ ও যোনি পূজার (গৌরীপট্ট) জন্য বাঙলা দেশে যত শিবমন্দির আছে, ভারতের আর কোথাও তত নেই। সূত্রসংহিতায় বলা হয়েছে যে দৈত্যরাজ বাণ মহাদেবের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। তিনি প্রতিদিন সহস্তে একটি শিবলিঙ্গ তৈরি করে, তাঁর অর্চনা করতেন। প্রত্নতাত্ত্বিকগণ বলেন যে বর্তমান বাণগড়ই (পশ্চিম দিনাজপুরে; প্রাচীন দেবীকোট বা কোটিবর্ষ) বাণরাজার রাজধানী ছিল। বাণের পিতা ছিলেন অসুররাজ বলি। মহাভারত অনুযায়ী অসুররাজ বলির মহিষী সুদেষ্ণার গর্ভেই অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম, পুণ্ড্র প্রভৃতি জাতিগুলির আদিপুরুষদের জন্ম হয়েছিল। বলি শিবেরই উপাসক ছিলেন। সুতরাং শিবপূজার সঙ্গে বঙ্গদেশের সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ। শিব যে প্রাগার্য দেবতা তা এখন পণ্ডিতমহলে সর্বজন স্বীকৃত। এটা মহেঞ্জোদারোয় আদি-শিবের প্রতিরূপ পাওয়া থেকেই বুঝতে পারা যায়। শিব মাতৃদেবীর ভর্তা। মাতৃদেবীর পূজার উদ্ভব বাঙলা দেশেই ঘটেছিল। বাঙলা দেশে মাতৃদেবীর পূজা যেরূপ জনপ্রিয়, শিবের গাজন উৎসবও (বিশেষ করে নিম্নকোটির লোকদের মধ্যে) সেরূপ জনপ্রিয়। প্রাগার্য কাল থেকেই এটা চলে আসছে। ঋগ্বেদে লিঙ্গ উপাসকদের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করা হয়েছে। তা থেকেই বুঝতে পারা যায় যে লিঙ্গ-উপাসনা প্রাগার্য সভ্যতার অবদান।

॥ সাত॥

আগেই বলেছি যে মাতৃদেবীর পূজা ও লিঙ্গ উপাসনা ভূমি কর্ষণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এ-কারণেই ভূমিকর্ষনের ওপর সৌর-শক্তির প্রভাব মানুষ বরাবরই লক্ষ্য করেছে। এ-কারণেই কৃষির প্রাচীন কেন্দ্র সমূহে আমরা মাতৃকাদেবীর পূজার সঙ্গে সূর্যপূজার সংযোগ লক্ষ্য করি। সূর্য পূজা অবশ্য বৈদিক আর্যগণের মধ্যেও প্রচলিত ছিল। পরবর্তীকালে আর্যদের সূর্যপূজা যে আগন্তুক মগ-ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক আনীত সূর্যপূজা

দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিল, তার প্রমাণও আছে। তবে প্রাগার্য সূর্যপূজা সম্পূর্ণ পৃথক। প্রাগার্য সূর্যপূজা এখনও লোকায়ত ধর্মের মধ্যে জীবিত আছে। বিহারের ছটপূজা এবং বাঙলার ইতুপূজা ও রালদুর্গার ব্রত তার প্রমাণ।

আরও অনেক পূজা, যথা নাগপূজা, অশ্বত্থবৃক্ষ পূজা, হিন্দু দশাবতার প্রভৃতির কল্পনা, আমরা প্রাগার্যদের কাছ থেকে পেয়েছি। এছাড়া আমরা আরও পেয়েছি শিল্প ও স্থাপত্য, লিপিপদ্ধতি, গোযান ও গোময়পিষ্টিকার ব্যবহার। (এ সম্বন্ধে বিশদ বিবরণের জন্য আমার 'প্রি-আরিয়ান এলিমেন্টস্ ইন ইণ্ডিয়ান কালচার', ১৯৩১ দ্রষ্টব্য)।

বাঙলার মধ্যযুগের লোকায়ত দেবদেবীসমূহ যে নবোপলীয় যুগের, তা মঙ্গলকাব্য সমূহের অভ্যন্তরীণ প্রমাণ (লহনা-খুল্লনা ও কালকেতুর কাহিনী তুলনা করুন) থেকেই বুঝতে পারা যায়। একটা উদাহরণ দিলেই এটা স্পষ্ট হবে। মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল'-এ ফুল্লরার বারমাস্যায় বর্ণিত হয়েছে– 'কার্তিক' মাসেতে হৈল হিমের জনম/জগজ্জনে কৈল শীত নিবারণ বসন।/নিযুক্ত করিল বিধি সভার কাপড়/অভাগী ফুল্লরা পরে হরিণের ছড়।' আমি বহুবার বহু জায়গায় বলেছি যে আমাদের দেশের প্রাচীন সাহিত্যসমূহের রচনাকাল এক, আর তার কাহিনীকাল আর এক। উপরের উদ্ধৃতিতে ফুল্লরার 'হরিণের ছড়' পরাটা নবোপলীয় যুগের বা প্রাচীন অষ্ট্রিক সমাজের বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্টই চণ্ডী-উপাসনার (বা মাতৃপূজার) উদ্ভবের প্রকৃত কাল ইঙ্গিত করে।

আজও বাঙালী নবোপলীয় ও তাম্রাশ্ম যুগের অনেক কিছু দ্রব্য ব্যবহার করে। কিছু উদাহরণ আগেই দিয়েছি। আরও কিছু উদাহরণ এখন দিচ্ছি। রক্ষণশীল পরিবারের ঠাকুর ঘরের কথা ধরা যাক। এ-সব পরিবারের পরিবেশ আগেও যা ছিল, এখনও তাই আছে। যুগ যুগ ধরে এসব পরিবারের ঠাকুরঘরের কোন পরিবর্তন ঘটেনি। এ-সব পরিবারের ঠাকুরঘরে ঢুকলেই দেখতে পাওয়া যাবে যে ঠাকুরঘরের সব বাসন-কোসন পাথর ও তামা দিয়ে তৈরি। যথা, পাথরের থালা-বাটি-গেলাস, তামার কোষাকুষি ইত্যাদি। এগুলো বাঙালী তাম্রাশ্ম যুগ থেকে একনাগাড়ে ব্যবহার করে আসছে। কেননা তামার কোষাকুষি আমরা মহিষদল ও পাণ্ডুরাজার ঢিবি থেকেও পেয়েছি। মহিষদল ও পাণ্ডুরাজার ঢিবির যে

স্তর থেকে আমরা ওইসব কোষাকুষি পেয়েছি, তা তাম্রাশ্ম যুগের।

প্রাগৈতিহাসিক প্রেক্ষাপট সম্বন্ধে যে আলোচনায় আমরা প্রবৃত্ত হয়েছিলাম, তা এখানেই শেষ করলাম। এই আলোচনার ফলে, পাঠক নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন যে আমাদের লৌকিক জীবনচর্যার বনিয়াদ গঠনে প্রাচীন মানবের যথেষ্ট অবদান আছে। সেটাই এই আলোচনার যুক্তি।

# আবয়বিক স্বাতন্ত্র্য ও কৃষ্টির বৈষম্য

যাঁরা আমার 'বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়' (জিজ্ঞাসা, প্রথম প্রকাশ ১৯৭৭, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৭৯, তৃতীয় সংস্করণ ১৯৮৬) বইখানা পড়েছেন, তাঁরা জানেন যে আবয়বিক নৃতত্ত্ব বা দেহের গঠনের দিক দিয়ে বাঙালী জাতি সমগ্র উত্তরভারতের জাতিসমূহ থেকে পৃথক। উত্তরভারতের জাতিসমূহের মধ্যে আগন্তুক আর্য-ভাষাভাষী 'নর্ডিক' নরগোষ্ঠীর লক্ষণযুক্ত উপাদানেরই প্রাধান্য লক্ষিত হয়। এই বৈশিষ্ট্য পূর্বদিকে বারানসী পর্যন্ত দৃশ্যমান হয়ে ক্রমশ ক্ষীয়মান ও বিলীন হয়ে গিয়েছে। এর পূর্বদিকে আমরা যে নৃতাত্ত্বিক উপাদান লক্ষ্য করি, তা ক্রমশ বর্ধমান হয়ে বাঙলাদেশে এসে কেন্দ্রীভূত হয়েছে। এক কথায়, এই উপাদানের focal point হচ্ছে বাঙলা দেশ। এই নৃতাত্ত্বিক উপাদানে যাদের দেহ গঠিত, তারাই হচ্ছে উচ্চশ্রেণীর বাঙালী। এরাও আর্য ভাষাভাষী আর এক নরগোষ্ঠীর বংশধর। নৃতত্ত্বের ভাষায় এদের 'আলপীয়' বলা হয়। এরা পঞ্চনদের উপত্যকায় আজও নর্ডিক উপাদানে গঠিত ঋগ্বেদ রচয়িতা আর্য ভাষাভাষী জাতি থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। নর্ডিকরা দীর্ঘশিরস্ক, আর আলপীয়রা বিস্তৃত শিরষ্ক। যদিও উচ্চশ্রেনীর বাঙালীরা আলপীয় পর্যায়ভূক্ত, তথাপি তাদের নিয়েই বাঙলার নৃতাত্ত্বিক সত্তা গঠিত হয়নি। আলপীয়রা ছিল, বাঙলায় আগন্তুক জাতি। সুতরাং তাদের আসবার আগেই বাঙলায় লোক বাস করত! তারা কারা?

॥ দুই ॥

বাঙলার আদিম অধিবাসীরা ছিল প্রাক্-দ্রাবিড় গোষ্ঠীর

লোক। নৃতত্ত্বের ভাষায় তাদের বলা হয় আদি-অস্ট্রাল। আদি-অস্ট্রাল বলবার উদ্দেশ্য হচ্ছে, অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে তাদের দৈহিক গঠনের মিল আছে। দৈহিক গঠনের মিল ছাড়া অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে তাদের রক্তেরও মিল আছে। মানুষের রক্ত সাধারণতঃ চার বর্গে ভাগ করা হয়। যথা– 'ও', 'এ', 'বি' এবং 'এ-বি'। ভারতের প্রাক্-দ্রাবিড় ও অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসী, এই উভয়ের রক্তেই 'এ' এগ্লুটিনোজেনের ('A' Agglutinogen) শতকরা হার খুব বেশী। তা থেকেই উভয়ের রক্তের সাদৃশ্য বোঝা যায়। (অতুল সুর 'বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়' দ্র)। এক সময় আদি অস্ট্রালদের ব্যাপ্তি উত্তর ভারত থেকে প্রশান্ত মহাসাগরের ইস্টার দ্বীপ পর্যন্ত ছিল। নৃতত্ত্ববিদগণ মনে করেন আনুমানিক ৩০,০০০ বৎসর পূর্বে তারা ভারত থেকে অস্ট্রেলিয়া মহাদেশে গিয়ে প্রথম পৌছায়।

বাঙলার আদিম অধিবাসীরা এই গোষ্ঠীর লোক। এদের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল আগন্তুক দ্রাবিড়-ভাষাভাষী জাতি। দ্রাবিড়-ভাষাভাষীদের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল আলপীয়দের আসবার আগে। আদি-অষ্ট্রাল, দ্রাবিড় ও আলপীয় নরগোষ্ঠীর লোকদের সংমিশ্রনেই বাঙলার নৃতাত্ত্বিক বনিয়াদ গঠিত হয়েছিল। এরা প্রথমে সকলেই ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় কথা বলত। আদি-অস্ট্রালরা যে ভাষায় কথা বলত তাকে বলা হয় 'অস্ট্রিক' ভাষার শাখা মুণ্ডারী ভাষা। এই অস্ট্রিক-মুণ্ডারী ভাষাই বাংলা ভাষার ভিত্তি স্থাপন করে। কেননা বাংলাভাষা এই ভাষার শব্দসমূহের প্রাচুর্যতার সাক্ষ্য বহন করে। বর্তমানে ভারতে এই ভাষায় কথা বলে সাঁওতাল, মুণ্ডা, কোরওয়া, জুয়াঙ, শবর প্রভৃতি উপজাতিসমূহ। অস্ট্রিক-মুণ্ডারী ভাষাভাষী জাতিসমূহের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে 'কুড়ি' (২০) সংখ্যাকে ভিত্তি করে উচ্চতর সংখ্যা প্রকাশ করা।

অনুরূপভাবে বাংলা ভাষায় দ্রাবিড় ভাষারও অনেক শব্দ আছে। দ্রাবিড় ভাষাভাষী লোকরা কোন এক সময় পূর্ব ও মধ্যভারতে ছিল, তা ওড়িশার কুই বা কন্ট, পারজি ও ওল্লার, বিহারের কুরুখ ও ওঁরাও, রাজমহল পাহাড়ের মালতো ও মধ্যপ্রদেশের কোলামি জাতিসমূহের ভাষা থেকে বুঝতে পারা যায়। এগুলি সবই দ্রাবিড় জাতির ভাষা থেকে উদ্ভুত।

॥ তিন ॥

অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় ভাষাভাষীদের পরে বাঙলায় আসে আলপীয়রা। আলপীয়রা যে বহুসংখ্যায় বাঙলায় এসেছিল, তা বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক গঠনে বিস্তৃতশিরস্কতার প্রাধাণ্য থেকে প্রমাণিত হয়, কেননা আদি-অস্ট্রালরা ছিল দীর্ঘ ও মধ্যম শিরস্ক ও দ্রাবিড়রা দীর্ঘশিরস্ক। আলপীয়রা আর্যভাষাতে কথা বলত, তবে দীর্ঘশিরস্ক বৈদিক নর্ডিক জাতির আর্যভাষার সঙ্গে তার কিছু পার্থক্য ছিল। ভাষাতত্ত্ববিদ গ্রিয়ারসন এটা লক্ষ্য করেছিলেন এবং এই পার্থক্যের ভিত্তিতে তিনি ভারতের আর্যভাষাগুলিকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করেছিলেন– (১) বহির্বতী (outer) আর্যভাষা ও অন্তর্বতী (inner) আর্যভাষা। প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত হচ্ছে বাংলা ভাষা, ও দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত হচ্ছে হিন্দী। 'আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প' নামক এক প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রন্থে বাংলা ভাষাকে 'অসুর' জাতির ভাষা বলা হয়েছে। এটা মহাভারতে উল্লিখিত অসুররাজ বলির ক্ষেত্রজ সন্তান থেকে বাঙালীরা উদ্ভুত, এই উক্তির দ্বারাও সমর্থিত হয়। মনে হয় আলপীয় আর্যরা গোড়ায় 'অসুর' নামেই পরিচিত ছিল, কেননা, ঋগ্বেদে আর্যদেবতা মণ্ডলীর অনেক দেবতাকে 'অসুর' বলে অভিহিত করা হয়েছে।

॥ চার ॥

মাত্র আবয়বিক নৃতত্ত্ব ও ভাষার দিক দিয়েই যে বাঙলা বৈষম্যের দেশ তা নয়। এই বৈষম্য আমরা কৃষ্টির ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করি। অশন-বসন, বসবাসের জন্য গৃহনির্মাণের রীতি, মন্দির-নির্মাণ, দেবতাকে খাদ্য নিবেদন, বিবাহ প্রথা, আদর্শনারীর কল্পনা, পাল-পরবের বিচিত্রতা, কৃষিকর্মের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন, পরিবহন ব্যবস্থা, রন্ধন-প্রক্রিয়া রন্ধনের জন্য তৈল-উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন ইত্যাদি নানা বিষয়ে আমরা বাঙলায় এক বৈচিত্রময় পরিস্থিতি লক্ষ্য করি। এই বৈচিত্র্য বাঙলার লোকের জীবনচর্যাকে বর্ণাঢ্য করে তুলেছে।

প্রথমেই অশনের কথা ধরা যাক। উত্তর-ভারতের প্রধান

খাদ্যশস্য গম। গম চূর্ণ করে আটা তৈরি করা হয়। আটা সিদ্ধ করে খাওয়া হয় না। আটাকে জল দিয়ে মেখে, তা থেকে রুটি তৈরি করে সেঁকে খাওয়া হয়। বাঙলার প্রধান খাদ্যশস্য ধান। ধান থেকে চাউল তৈরি করা হয়। চাউল সিদ্ধ করে খাওয়া হয়। তাছাড়া, চাউল থেকে মুড়ি ও ধান্য থেকে খই ও চিঁড়া তৈরি করা হয়। তার মানে, বাঙলার লোক সিদ্ধ বা ভাজা খাদ্য খায়। আর উত্তর ভারতের লোক সেঁকা খাদ্য খায়। রন্ধনক্রিয়ায় বাঙালী সরিষার তৈল ব্যবহার করে। উত্তর ভারতের লোক ঘৃত ব্যবহার করে। বাঙালী যত রকমের ব্যঞ্জন তৈরি করতে জানে, উত্তর ভারতের লোকরা তা জানে না। বাঙলার লোকেরা মাছ খায়। উত্তরভারতের লোকেরা মাছ খায় না।

মিষ্টান্ন প্রস্তুতের ক্ষেত্রেও আমরা উত্তর ভারতের সঙ্গে বাঙলার বৈলক্ষণ্য লক্ষ্য করি, যদিও বর্তমানে যোগাযোগের ফলে পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটেছে। তা না হলে ক্ষীরের পেঁড়া ও লাড্ডুই উত্তর ভারতের শ্রেষ্ঠ মিষ্টান্ন ছিল। বাঙলায় ছানা দিয়ে তৈরি সন্দেশই শ্রেষ্ঠ মিষ্টান্ন। ঘিয়েভাজা নোনতা খাবার যথা নিমকি, সিঙ্গারা, কচুরি ও মিষ্টি খাবার যথা জিলাপি, অমৃতি, বালুসাই, মুগের লাড্ডু প্রভৃতি উত্তর ভারতের অবদান; আর বাঙলার অবদান হচ্ছে রসে সিদ্ধ করা রসগোল্লা, রসমালাই ইত্যাদি। নারিকেল সহকারে মিষ্টান্ন প্রস্তুত বাঙলারই বৈশিষ্ট্য। এছাড়া, পিঠেপুলি তৈরি করাও বাঙলার বৈশিষ্ট্য।

যেহেতু মানুষ তার দেবতাকে বরাবরই নিজের প্রতিরূপেই কল্পনা করে এসেছে, সে হেতু সে তার নিজের প্রধান ও প্রিয় খাদ্যসমূহ, তার দেবতার জন্যও ব্যবস্থা করেছে। সেজন্য, আমরা দেখি বাঙালী তার দেবতাকে চাউলের নৈবেদ্য নিবেদন করে। উত্তর ভারতের লোকরা তা করে না। তারা দেবতাকে ছাতু ও চিনির তৈরি এলাচদানা নিবেদন করে। বাঙালী দেবতার নৈবেদ্যে সন্দেশ, নারিকেল নাড়ু, কলা ইত্যাদি ব্যবহার করে। উত্তর ভারতের লোকরা এরূপ করে না। মনে রাখা দরকার কলা বাঙালীর প্রিয় খাদ্য।

॥ পাঁচ ॥

বসনভূষনের দিক দিয়েও বাঙলার মেয়েরা (বিধবা ছাড়া) পাড়বিশিষ্ট শাড়ি পরে। তার মানে তারা সেলাই বিহীন বস্ত্র ব্যবহার করে। কিন্তু রাজস্থান ও পাঞ্জাবের মেয়েরা সেলাই-করা বসন পরে। পুরুষের ধুতিও বাঙলায় যে কায়দায় পরা হয়, অন্যত্র তা হয় না। বাঙলায় চটি-জুতার ব্যবহারই প্রচলিত ছিল। কিন্তু উত্তর ভারতের লোকরা গোড়ালি-বিশিষ্ট জুতা পরত।

গৃহ নির্মানের ক্ষেত্রেও আমরা বৈচিত্র্য লক্ষ্য করি। বাঙলা দেশে ছ্যাঁচা-বেড়া দিয়ে কাঠামো তৈরি করে, তার গায়ে কাদামাটি লেপে কুঁড়েঘর তৈরি করা হয়। বিহারে বা উত্তর প্রদেশে তা করা হয় না। সেখানে কাদামটি দিয়ে প্রথম এক হাত উচ্চতা পরিমাণ এক থাক দেওয়াল তৈরি করা হয়। তারপর সে-থাক শুকিয়ে গেলে তার ওপর কাদামাটি দিয়ে দ্বিতীয় আর এক থাক্ তৈরি করা হয়। এইভাবে কুড়েঘরের উচ্চতা-প্রমাণ দেওয়াল তৈরি করা হয়। ঘরের ছাদ কোথাও খড়, আবার কোথাও গোলপাতা দিয়ে ঢাকা হয়। কোথাও কোথাও 'খোলা' দিয়েও ছাদ ঢাকা হয়।

ভারতের লোকরা রন্ধণ-ক্রিয়ায় নানারূপ তৈল ব্যবহার করে। তৈলবীজ থেকে তৈল-নিষ্কাশন ভারতের নানা অঞ্চলে নানা পদ্ধতিতে করা হয়। এর জন্য নানারূপ কৌশল ও যন্ত্রাদি ব্যবহৃত হয়। বাঙলার বিভিন্ন জেলায় যথা নদীয়া, চব্বিশ পরগনা, হুগলি, বর্ধমান ও বীরভূমে পিড়ি-বিশিষ্ট ঘানির প্রচলনই বেশি। দুই বলদ-টানা নালিবিহীন ঘানি যা ওড়িশার পুরী জেলার গ্রামাঞ্চলে, গঞ্জাম জেলায় ও অন্ধ্রপ্রদেশে প্রচলিত আছে, তা এক সময় হুগলি জেলার আরামবাগ অঞ্চলে ও মেদিনীপুরের কাঁথি অঞ্চলের দক্ষিণেও প্রচলিত ছিল।

দেবতার জন্য মন্দির-নির্মাণ ভারতীয় কৃষ্টির এক প্রধান বৈশিষ্ট্য। ভারতের অন্যত্র যে রীতিতে মন্দির নির্মাণ হয়, বাঙলা দেশে সে রীতিতে তৈরি হয় না। বাঙলার মন্দিরগুলি হয় (১) 'চালা' মন্দির, আর তা নয়তো (২) রত্ন মন্দির। উত্তর ভারতের 'নগর' রীতিতে গঠিত মন্দির থেকে এগুলি পৃথক। তবে বাঙলায় 'নগর' রীতিতে তৈরি মন্দির যে একসময় ছিল না, তা নয়। সুন্দরবনের জটার দেউল 'নগর' রীতিতে গঠিত

মন্দিরের এক নিদর্শন।

॥ ছয় ॥

ধর্মীয় ক্ষেত্রেও আমরা উত্তরভারতের সঙ্গে বাঙলার বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করি। বাঙলার লোকায়ত দেবদেবীসমূহ উত্তর ভারতের লোকায়ত দেবদেবী থেকে পৃথক। আমরা ভাদ্র, পৌষ ও চৈত্র মাসে লক্ষ্মীপূজা করি। উত্তর ভারতের লোকরা তা করে না। জাতীয় উৎসব যথা দুর্গাপূজা, দশেরা, দীপাবলী, দেওয়ালী, হোলি, দোলযাত্রা প্রভৃতির মধ্যেও আমরা বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করি। এগুলির অনুষ্ঠানের রূপ ও সময়কাল উত্তরভারত ও বাঙলায় পৃথক। দুর্গাপূজা মূলগতভাবে বাঙলা দেশের উৎসব। যদিও 'দশেরা' উৎসবকে দুর্গাপূজার সমগোত্রে ফেলা হয়, তা হলেও মূলগতভাবে এটা স্বতন্ত্র উৎসব। বাঙলাদেশে 'হোলি' বা 'দোলযাত্রা' ফাল্গুনী পূর্ণিমার সূচনায় অনুষ্ঠিত হয়। এদিনই জনগন পরস্পর পরস্পরের গায়ে রঙ দেয়। উত্তরভারতে পূর্ণিমা ছাড়বার সময় বা পরদিনই রঙ দেওয়া হয়। উৎসবের মর্যাদার দিক থেকেও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বৈসাদৃশ্য লক্ষিত হয়। বাঙলার শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গোৎসব। কিন্তু সংলগ্ন বিহার প্রদেশে তা নয়। সেখানে কার্ত্তিকী ষষ্ঠীতে অনুষ্ঠিত 'ছট' পরবই বছরের শ্রেষ্ঠ উৎসব।

সামাজিক বিচিত্রতাও অদ্ভুত। বাঙলায় বিবাহের আচার-ব্যবহার, (বিশেষ করে স্ত্রী আচার ও নাপিতের ভূমিকা) উত্তরভারতের বিবাহের আচার-ব্যবহার থেকে পৃথক। উত্তরাধিকার সম্বন্ধেও উত্তরভারতে ভিন্ন বিধান প্রচলিত। উত্তর ভারতে উত্তরাধিকার মিতাক্ষরা বিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। বাঙলাদেশে এটা নিয়ন্ত্রিত হয় দায়ভাগ বিধান দ্বারা।

॥ সাত ॥

আগেই বলেছি যে বাঙালীর জীবনচর্যা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিল অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় গোষ্ঠীর লোকদের

সংস্কৃতি দ্বারা। এই সংস্কৃতির অন্তর্ভূক্ত ছিল মৃত্যু-উত্তর জীবনে বিশ্বাস, পিতৃপুরুষগণের পূজা, কৃষি সম্পর্কিত অনেক উৎসব, যথা পৌষপার্বণ, নবান্ন প্রভৃতি; মেয়েদের দ্বারা পালিত অনেক ব্রত এবং ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানে চাউল, দূর্বা, কলা, হরিদ্রা, সুপারি ও পান, নারিকেল, সিঁদুর, কলাগাছ প্রভৃতির ব্যবহার; শিলা, বৃক্ষ ও লিঙ্গপূজা, পূজায় ঘটের ব্যবহার ইত্যাদি। এগুলি আর্য-অন্তর জাতিসমূহের ধর্মীয় আচারের অন্তর্গত। চড়ক, গাজন প্রভৃতি উৎসবও বাঙলাদেশের বৈশিষ্ট্য। এরূপ অনুমান করবার সপক্ষে যথেষ্ট যুক্তি আছে যে, বাঙালীর এই সকল বৈশিষ্ট্য প্রাক-আর্য যুগ থেকে প্রচলিত আছে। যোগ অভ্যাস এর অন্যতম। লিঙ্গরূপী শিবপূজা, মাতৃদেবীর পূজা প্রভৃতি বাঙলা দেশেই প্রাক্-আর্যকাল থেকে চলে এসেছে। তন্ত্রধর্মের উদ্ভবও বাঙলা দেশেই হয়েছিল। বাঙালী সংস্কৃতির আরও অনেক বৈশিষ্ট্যের কথা মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেছেন, যেমন— হস্তিবিদ্যা, রেশমবয়ন, সাংখ্যদর্শন, প্রেক্ষাগৃহ (বা রঙ্গালয়), নৌকা ও জাহাজ নির্মান প্রভৃতি। এসব বাঙালী সংস্কৃতির অবদান। সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে উলুধ্বনি দেওয়া, আলপনা অঙ্কন, কাঁথা সেলাই করা, বড়ি দেওয়া প্রভৃতিও বাঙালী সংস্কৃতির নিজস্ব অবদান।

# জনগণের জনজীবন

বৈদিক সাহিত্য থেকে আমরা জানতে পারি যে, আর্যরা প্রথমে পঞ্চনদের উপত্যকায় এসে বসতি স্থাপন করে। তারপর তারা ক্রমশ পূর্বদিকে অগ্রসর হতে থাকে। কিন্তু তাদের এই অগ্রগতি বিদেহ বা মিথিলা পর্যন্ত এসে থেমে যায়। সেখানে তারা প্রতিহত হয়েছিল প্রাচ্য দেশের লোকদের কাছে। প্রাচ্য দেশেয় লোকদের তারা ঘৃণার চক্ষে দেখত, ও তাদের 'ব্রাত্য' বলে অভিহিত করত। ব্রাত্যদের আচার-ব্যবহার ও পূজাপদ্ধতি আর্যদের আচার-ব্যবহার ও পূজা-পদ্ধতি থেকে স্বতন্ত্র ছিল। তার কারণ, ব্রাত্যরা তথা বাঙলা দেশের আদিম অধিবাসীরা বৈদিক আর্যগণ থেকে ভিন্ন নরগোষ্ঠীর লোক ছিল। বাঙলার দেবদেবীগণ যে আর্য দেবতাসমূহ থেকে পৃথক ছিল, তার প্রমাণ আমরা বৌধায়ন ধর্মসূত্র থেকে পাই। আর্যসমাজের অনেক উদার মনভাবাপন্ন লোক বাঙলার সে-সকল দেবদেবীগণের পীঠস্থানে তীর্থযাত্রা করতে আসতেন। বৌধায়ন ধর্মসূত্রে বলা হয়েছে যে তীর্থযাত্রা উপলক্ষে যারা বাঙলা দেশে যাবে, তাদের পুনোষ্টম যজ্ঞ করে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

যদিও মৌর্যযুগ থেকেই বাঙলায় ব্রাহ্মণদের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল, তা হলেও ব্যাপকভাবে ব্রাহ্মণরা বাঙলায় আসতে শুরু করে গুপ্তযুগে। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অনুপ্রবেশের পূর্বে বাঙলাদেশে বাঙলার আদিম অধিবাসীদের ধর্মই অনুসৃত হত। মৃত্যুর পরে আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস, মৃত ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা, বিবিধ ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়া ও মন্ত্রাদি, প্রকৃতির সৃজন শক্তিকে মাতৃরূপে পূজা, লিঙ্গ পূজা, কুমারী পূজা, 'টোটেম'-এর প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা, এবং গ্রাম, নদী, বৃক্ষ, অরণ্য, পর্বত ও

ভূমির মধ্যে নিহিত শক্তির পূজা, মানুষের ব্যাধি ও দুর্ঘটনা সমূহ দুষ্ট শক্তি বা ভুত-প্রেত দ্বারা সংঘটিত হয় বলে বিশ্বাস ও বিবিধ নিষেধাজ্ঞাজ্ঞাপক অনুশাসন ইত্যাদি নিয়েই বাঙলার আদিম অধিবাসীদের ধর্ম গঠিত ছিল। কালের বিবর্তনে এই সকল বিশ্বাস ও আরাধনা-পদ্ধতি ক্রমশ বৈদিক আর্যগণ কতৃক গৃহীত হয়েছিল, এবং সেগুলি হিন্দুধর্মের অন্তর্ভূক্ত হয়ে জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি আনুষ্ঠানিক ধর্মকর্মে পরিণত হয়েছিল। বস্তুতঃ ব্রাহ্মণ্যধর্মের অনেক কিছু পূজা-পার্বণের অনুষ্ঠান, যেমন দুর্গাপূজার সহিত সংশ্লিষ্ট নবপত্রিকার পূজা ও শবরোৎসব, নবান্ন, পৌষপার্বণ, হোলি, ঘেঁটুপূজা, চড়ক, গাজন, প্রভৃতি এবং আনুষ্ঠানিক কর্মে চাউল, কলা, কলাগাছ, নারিকেল, সুপারি, পান, সিঁদুর, ঘট, আলপনা, শঙ্খধ্বনি, উলুধ্বনি, গোময় এবং পঞ্চগব্যের ব্যবহার ইত্যাদি সবই আদিম অধিবাসীদের কাছ থেকে নেওয়া হয়েছিল। তাদের কাছ থেকে আরও নেওয়া হয়েছিল আটকৌড়ে, শুভচনী পূজা, শিশুর জন্মের পর ষষ্ঠী পূজা, বিবাহে গাত্রহরিদ্রা, পানখিলি, মোনামুনি ভাসানো, গুটিখেলা, স্ত্রী-আচার, লাজ বা খই-ছড়ানো, দধিমঙ্গল, লক্ষ্মীপূজার সময় ঝাঁপি স্থাপন, অলক্ষ্মীর পূজা ইত্যাদি আচার-অনুষ্ঠান যা বর্তমান কালেও বাঙালী হিন্দু পালন করে থাকে। এসবই প্রাক্-আর্য সংস্কৃতির অবদান। এছাড়া, নানারূপ গ্রাম্য দেবদেবীর পূজা, ধ্বজাপূজা, বৃক্ষের পূজা, বৃষকাষ্ঠ, যাত্রাজাতীয় পর্বাদি যেমন স্নানযাত্রা, রথযাত্রা, ঝুলনযাত্রা, রাসযাত্রা, দোলযাত্রা প্রভৃতি এবং ধর্মঠাকুর চণ্ডী, মনসা, শীতলা, জাঙ্গুলী, পর্ণশবরী প্রভৃতির পূজা, ও অম্বুবাচী, অরন্ধন ইত্যাদি সমস্তই আমদের প্রাক্-আর্য জাতিসমূহের কাছ থেকে নেওয়া।

॥ দুই ॥

এই সকল উপাদানের ভিত্তিতেই গঠিত হয়েছিল বাঙলার লৌকিক সংস্কৃতি। দক্ষিণ আমেরিকার প্রাচীন মায়া জাতির ন্যায় বাঙলার সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য ছিল লৌকিক জীবনচর্যার ওপর জ্যোতিষের প্রভাব। সে প্রভাব বাঙালী আজও কাটিয়ে উঠতে পারেনি। সামাজিক জীবনে বিবাহই হচ্ছে সবচেয়ে

বড় আনুষ্ঠানিক সংস্কার। বাঙালী পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের সময় কোষ্ঠী-ঠিকুজিতে সপ্তম ঘরে কোন গ্রহ বা সপ্তমাধিপতি কোন ঘরে আছে তার বিচার করে। যদি সপ্তম ঘরে কোন পাপগ্রহ (মঙ্গল, শনি, রাহু, কেতু, রবি) থাকে, তবে সে বিবাহ বর্জন করে। তারপর গণের (দেব, রাক্ষস ও নর গণ) মিল ও অমিলও দেখে। যোটক বিচারও করে। আবার সব মাসেও বাঙালীর বিবাহ হয় না। বারো মাসের মধ্যে মাত্র সাত মাসে (বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, অগ্রহায়ণ, মাঘ ও ফাল্গুন) বিবাহ হয়। তারপর জ্যৈষ্ঠ মাসে বাঙালী জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহ দেয় না। বিবাহের পর আসে দ্বিরাগমনের ব্যাপার। বাঙালী পঞ্জিকা দেখে দ্বিরাগমনের দিন স্থির করে। শুধু তাই নয়, এ বিষয়ে কালবেলা, বারবেলা, কালরাত্রি ইত্যাদি পরিহার করে। বাঙালী বিবাহিতা মেয়েদের জীবনে আরও অনেক অনুষ্ঠান আছে, যথা গর্ভাধান, বা প্রথম রজঃদর্শন, পুংসবন, পঞ্চামৃত, সাধ, সীমন্তোয়ন ইত্যাদি। এসব অনুষ্ঠানের জন্যও পঞ্জিকা দেখে দিন স্থির করা হয়।

উপনয়নের ক্ষেত্রেও, বিবাহের মত পঞ্জিকার নির্দেশ অনুসৃত হয়। এছাড়া আছে নামকরণ, নিষ্ক্রমন, অন্নপ্রাশন, চুড়াকরণ, কর্ণবেধ, বিদ্যারম্ভ, দীক্ষা, ইত্যাদি অনুষ্ঠান। এসবও পঞ্জিকা নির্দেশিত দিনে অনুষ্ঠিত হয়।

বাঙালীর বৈষয়িক ও ধর্মীয় জীবনেও জ্যোতিষের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। গৃহারম্ভ, গৃহপ্রবেশ, নববস্ত্র পরিধান, রত্নধারণ, দেবগৃহারম্ভ, জলশয়ারম্ভ, জলাশয় প্রতিষ্ঠা, নৌকাগঠন, নৌকাচালন, নৌকাযাত্রা ক্রয়বাণিজ্য, বিক্রয়বাণিজ্য, বিপণ্যারম্ভ, রজোদর্শন, ঔষধকরণ, ঔষধসেবন, গ্রহপূজা, শান্তিস্বস্ত্যয়ন, আরোগ্যস্নান, হলপ্রবাহ, বীজবপন, বৃক্ষাদিরোপন, ধান্যরোপন, ধান্যছেদন, ধান্যস্থাপন, ধান্যনিষ্ক্রমণ, নাট্যারম্ভ, নবান্ন, ঋণদান, ঋণগ্রহণ ইত্যাদি এ-সবের অন্তর্ভূক্ত ছিল। যদিও আজকাল এসব ব্যাপারে বাঙালী অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আর দিন-ক্ষণ দেখে না, তথাপি যারা মানে তাদের হিতার্থে পঞ্জিকায় এ-সকল ব্যাপারের প্রশস্ত দিন সমূহ উল্লেখিত থাকে। এ-সকল দিন যে পঞ্জিকায় দেখানো থাকে, তা থেকে পরিষ্কার বুঝতে পারা যায় যে এক সময় বাঙালীর লৌকিক জীবনে দিন-ক্ষণ দেখেই এ-সকল ব্যাপার অনুষ্ঠিত হত।

বাঙালীর লৌকিক জীবনে জ্যোতিষিক প্রভাবের শেষ এখানেই নয়। খাদ্যাখাদ্য ও উপবাস সম্বন্ধেও বাঙালীকে অনেক জ্যোতিষিক অনুশাসন মানতে হত। এবং এখনও হয়। উপবাস সম্বন্ধে যে বচন অনুসরণ করা হত, তা হচ্ছে– 'শোয়া ওঠা পাশ মোড়া। তার অর্ধেক ভীমে ছোড়া ॥ ক্ষ্যাপার চৌদ্দ, ক্ষ্যাপীর আট। এ নিয়েই কাল কাট ॥' তার মানে শয়ন একাদশী (আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষের একাদশী), পার্শ্বপরিবর্তন (ভাদ্র বা আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষের একাদশী), ভীম একাদশী (মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের একাদশী), উত্থান একাদশী (কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষের একাদশী), শিবরাত্রি (ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী) ও দুর্গাষ্টমী (আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষের অষ্টমী)– এগুলিই ছিল উপবাসের বিশিষ্ট দিন। প্রসঙ্গত এখানে বলা যেতে পারে যে এই সব জ্যোতিষিক অনুশাসন বা তথ্যসমূহ, এরূপ ছড়ার আকারেই বাঙালীর লৌকিক সমাজে প্রচলিত ছিল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ খনা ও ডাকের বচনের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। যুগে যুগে এগুলোর ভাষা পরিবর্তিত হয়েছে, কিন্তু এগুলো এসেছে অতি প্রাচীনকাল থেকে।

বাঙালীর লৌকিক জীবনে খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে আরও বিধিনিষেধ আছে। অরণ্যষষ্ঠী বা জামাইষষ্ঠীর দিন সন্তানবতী সধবা স্ত্রীলোকেরা মাছ খায় না। জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রতি মঙ্গলবার জয়মঙ্গলবার হিসাবে গণ্য হয়। ওদিনও মাছ খাওয়া নিষিদ্ধ। অগ্রহায়ন মাসের প্রতি রবিবার ইতুপূজার দিন। ওই সকল দিনেও মেয়েরা মাছ খায় না। পশ্চিমবঙ্গে শ্রীপঞ্চমীর দিনও স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে হিন্দুরা মাছ খায় না। দশহরার দিন ফলার আহার করবার বিধান আছে। এছাড়া, কোন কোন দিনে ঠাণ্ডা খাদ্য খাবার নিয়ম আছে। তার মধ্যে পড়ে ভাদ্র মাসের সংক্রান্তিতে অরন্ধন। ওই দিন তপ্ত খাদ্য খাওয়া নিষিদ্ধ। মাত্র পূর্বদিনের রান্না-করা খাদ্যই খাওয়া হয়। মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের ষষ্ঠী 'শীতল ষষ্ঠী' নামে আখ্যাত। ওই দিনও ঠাণ্ডা খাওয়া হয়। কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার দিন নারিকেল ও চিড়ে খায়। শীতল ষষ্ঠীর দিন দই দিয়ে কড়াই সিদ্ধ খায়। ওই দিন পূর্বদিনে সিদ্ধ কড়াই খাবার রীতি আছে। এছাড়া, জ্যৈষ্ঠ মাসে লাউ খাওয়া নিষিদ্ধ। মাঘ মাসে মুলা খাওয়া নিষিদ্ধ। এগুলির মধ্যে প্রায় সবগুলিই বাঙালী হিন্দু আজ পর্যন্ত পালন করে আসছে। তবে

পঞ্জিকায় যে-সকল খাদ্য বা কর্ম বিভিন্ন তিথিতে নিষিদ্ধ বলে চিহ্নিত করা আছে, তার অনেকগুলিই বাঙালী হিন্দু আজ আর মানে না। সে-সকল নিষিদ্ধ দ্রব্যের অন্তর্ভূক্ত হচ্ছে প্রতিপদে কুমড়া, দ্বিতীয়ায় ছোট বেগুন, তৃতীয়ায় পটল, চতুর্থীতে মুলা, পঞ্চমীতে বেল, ষষ্ঠীতে নিম, সপ্তমীতে তাল, অষ্টমীতে নারিকেল, নবমীতে লাউ, দশমীতে কলমি শাক, একাদশীতে শিম, দ্বাদশীতে পুঁই শাক ও ত্রয়োদশীতে মাষকলাই। এগুলি থেকে বাঙালীর খাদ্যে তরিতরকারির একটা হদিশ পাওয়া যায়। লক্ষণীয় এর মধ্যে আলু বা কপি নেই। তার কারণ, এগুলি বিদেশী তরিতরকারি। মাত্র দু-তিনশো বছর আগে আমাদের দেশে আমদানি হয়েছে। এছাড়া অষ্টমী, নবমী, চতুর্দশী, পূর্ণিমা বা অমাবস্যাতে স্ত্রী, তৈল, মৎস্য-মাংসাদি সম্ভোগও নিষিদ্ধ।

॥ তিন ॥

আদিম সমাজসমূহের সংস্কৃতির গঠনে মেয়েদের প্রভাবই বেশি পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। বাঙালীর লৌকিক সংস্কৃতিতেও আমরা সেই প্রভাবই লক্ষ্য করি। বাঙালী মেয়েদের জীবন শুরু হত কতকগুলি ব্রতপালন নিয়ে। যেমন পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত কুমারী মেয়েরা বৈশাখ মাসে শিবপূজা ও পুণ্যিপুকুর, কার্তিক মাসে কুলকুলতি, পৌষমাসে সোদর, মাঘমাসে মাঘমণ্ডল ইত্যাদি ব্রত করত। আর সধবা মেয়েদের তো সারা বছর ধরেই কোন না কোন ব্রত লেগে থাকত। এছাড়া, বৈশাখ মাসে বিধবাদের ছিল কলসী উৎসর্গ।

সামাজিক জীবনে মেয়েদের শাস্ত্রবহির্ভূত কতকগুলি আচার-অনুষ্ঠান আছে। এ বিষয়ে বাঙালী মেয়েরা সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয় বিবাহ সম্পর্কিত স্ত্রী-আচারসমূহের ওপর। বাঙলা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিবাহের শাস্ত্রীয় পদ্ধতি এক হলেও স্ত্রী-আচারসমূহের আঞ্চলিক পার্থক্য দেখা যায়। এই সকল লৌকিক আচারের অন্তর্ভূক্ত হচ্ছে আইবুড়ো ভাত, দধিমঙ্গল, গায়ে হলুদ, কলাতলায় স্নান করানো ও বরণ করা, হাই-আমলা, ছাদনা-তলার অনুষ্ঠানসমূহ, গাঁটছড়া বাঁধা, দুধ-আলতা অনুষ্ঠান, কড়ি বা গুটি খেলা, কালরাত্রি পালন

করা, ফুলশয্যা ইত্যাদি। এছাড়া, বিয়ের কয়েক দিন বরের পক্ষে জাঁতি ও মেয়ের পক্ষে কাজললতা বহন করার বিধি আছে। এগুলি সবই প্রাক-আর্য কালের মেয়েলি লৌকিক সংস্কৃতি।

আজকালকার দিনে মেয়েদের বেশি বয়সে বিবাহ হয়। সে জন্য প্রথম রজঃদর্শনের উৎসব হয় না। কিন্তু আগেকার দিনে যখন মেয়েদের আট-দশ বছর বয়সে বিবাহ হত, তখন মেয়েরা খুব ধুমধাম করে প্রথম রজঃদর্শনের উৎসব পালন করত। শুধু তাই নয়। মেয়েটিকে কয়েকদিন ধরে ঘরের নিভৃত কোণে লুকিয়ে বসে থাকতে হত ও নিয়মনিষ্ঠ আহারাদি ও একটি পোটলার মধ্যে নানারকম ফল ও একটি প্রস্তরখণ্ডকে সন্তান কল্পনা করে প্রসবের অভিনয় করতে হত।

আগেকার দিনে মেয়েদের কমবয়সে বিবাহ হত বলে, মেয়েরা কিছুকাল বাপের বাড়িতেই থাকত। তারপর যখন দ্বিতীয় বার স্বামীগৃহে ফিরে আসত, তাকে দ্বিরাগমন বলা হত। এটা বিহারের 'গৌনা' অনুষ্ঠানের সামিল। এখনও বিহারে ধুমধাম করে এই অনুষ্ঠান পালিত হয়। যদিও শাস্ত্রীয় অনুশাসন অনুযায়ী বারো বছরের পর মেয়ের বিয়ে হলে, দ্বিরাগমনের আর কোন প্রয়োজন নেই, তা হলেও লৌকিক আচার অনুযায়ী এখনও বিয়ের অব্যবহিত পরে দ্বিরাগমন পালিত হয়। শাস্ত্রীয় অনুশাসনের অভাব সত্ত্বেও দ্বিরাগমন পালন, লোকিক সংস্কৃতির ওপর 'ট্রাডিশন' বা পরম্পরার প্রভাব জ্ঞাপন করে। তেমনই যদিও আগেকার দিনে সধবা স্ত্রীলোকগণ কর্তৃক পালিত শাস্ত্রীয় অনেক আচার- অনুষ্ঠান লুপ্ত হয়ে গিয়েছে, তা হলেও লৌকিক অনুষ্ঠানসমূহ এখনও প্রচলিত আছে। প্রচলিত লৌকিক ব্রতগুলি মেয়েরাই পালন করে, পুরুষরা নয়। এ সমস্ত ব্রতে পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না। তা থেকে বুঝতে পারা যায় যে, এগুলি বাঙলায় ব্রাহ্মণ্যধর্মের অনুপ্রবেশের পূর্ব হতেই পালিত হয়ে আসছে। পৌষ, চৈত্র ও ভাদ্র মাসে যে লক্ষ্মীপূজা পুরোহিতের সাহায্যে করা হয়, তাকে আগেকার দিনে (বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্যন্ত) 'খন্দ'পূজা বলা হত। বোধ হয় গ্রামাঞ্চলে এখনও বলা হয়। 'খন্দ' শব্দটা খুবই অর্থবাচক শব্দ এবং আদিম 'খন্দ' জাতির সঙ্গে এর সম্পর্কের ইঙ্গিত করে, যদিও অভিধানে 'খন্দ' শব্দের অর্থ দেওয়া আছে 'ফসলাদি'। তবে লক্ষ্মীপূজা যে আদিম সমাজ

থেকে গৃহীত, তা লক্ষ্মীর ঝাঁপির উপকরণসমূহ থেকে বুঝতে পারা যায়। এ সম্পর্কে আরও লক্ষণীয় যে আশ্বিন মাসের পূর্ণিমায় কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা, দেওয়ালীর দিনের লক্ষ্মীপূজা ও পৌষ-চৈত্র-ভাদ্র মাসের লক্ষ্মীপূজা পুরোহিতের সাহায্যে করা সত্ত্বেও, মেয়েরা নিজে নিজে প্রতি বৃহস্পতিবার লক্ষ্মীপূজা করে ও লক্ষ্মীর পাঁচালী পাঠ করে। নানা অঞ্চলে নানা নামে মঙ্গলচণ্ডীর পূজা হয়, যথা হরিশ মঙ্গলচণ্ডী, নাটাই মঙ্গলচণ্ডী, সঙ্কট মঙ্গলচণ্ডী, ভাদাই মঙ্গলচণ্ডী ইত্যাদি। দেবী ভাগবতে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, মঙ্গলচণ্ডী নারীগণ কর্তৃক পূজিতা দেবতা– 'যোষিতানাম ইষ্টদেবতাম', এবং চণ্ডী সম্বন্ধে মূর্তিনির্মাণ সম্পর্কিত কতকগুলি গ্রন্থে বলা হয়েছে– 'গোধাসনে ভবেদ্ গৌরী লীলয়া হংসবদনা / অক্ষসূত্রম্ তথা পদ্মম্ অভয়ং চ বরং তথা। গোধাসনাশ্রিতা মূর্তি গৃহে পূজ্য স্ত্রীয় সদা।'

ষষ্ঠীর পূজার সঙ্গেও মেয়েদের সম্পর্ক দেখা যায়। সন্তানের মঙ্গল কামনায় ষষ্ঠীদেবী মাতৃজাতির একান্ত আরাধ্য। সন্তানের মঙ্গল কামনায় নানাসময় এর পূজা করা হয়। সন্তান জন্মের ছয় দিনে সন্ধ্যায় ষেঠেরা পূজা করা হয়। সন্তান জন্মের একুশ বা ত্রিশ দিনে ষষ্ঠী পূজা করার প্রথা প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত। অন্নপ্রাশন প্রভৃতি শুভকাজে, সকল কাজের আগে ষষ্ঠীর পূজা করা হয়। তাছাড়া বছরের বিভিন্ন মাসে নানা নামে ষষ্ঠী ঠাকরুণের পূজা করা হয়। যেমন বৈশাখ মাসে চান্দনী ষষ্ঠী, জ্যৈষ্ঠ মাসে অরণ্য ষষ্ঠী, আষাঢ় মাসে কার্দমী ষষ্ঠী, শ্রাবণ মাসে নোটন ষষ্ঠী, ভাদ্র মাসে চাপড়া ষষ্ঠী, আশ্বিন মাসে দুর্গা ষষ্ঠী, কার্তিক মাসে নাড়ি ষষ্ঠী, অগ্রহায়ণ মাসে মূলো ষষ্ঠী, পৌষ মাসে গুহ ষষ্ঠী, মাঘ মাসে শীতল ষষ্ঠী, ফাল্গুন মাসে গো ষষ্ঠী ও চৈত্র মাসে অশোক ষষ্ঠী। ষষ্ঠী তিথি ছাড়া অন্য কোন দিনেও ষষ্ঠী পূজার প্রচলন আছে। যেমন অগ্রহায়ন মাসের শুক্ল প্রতিপদে হরি ষষ্ঠী, চৈত্র মাসে সংক্রান্তির পূর্বদিনে নীল ষষ্ঠী। নদীয়া জেলায় হরি ষষ্ঠীতে কাঁচা ঘট পূজা করা হয়। নীল ষষ্ঠীতে মেয়েরা উপবাস করে ও সন্ধ্যায় শিবের পূজা দিয়ে উপবাস ভঙ্গ করে। মেয়েরা মনে করে যে নীলের দিনই শিবের বিবাহ হয়েছিল। অনুরূপভাবে তারা শ্রাবণ মাসের যে কোন সোমবারে শিবের উপবাস করে, কেননা শ্রাবণ মাস হচ্ছে

শিবের জন্মমাস। অরণ্য ষষ্ঠী যে এক সময় অরণ্যেই পূজিত হতেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এ-সম্বন্ধে যে উপাখ্যান আছে, তা থেকেই তা প্রমাণ হয়।

বাঙলার দুটি জনপ্রিয় লৌকিক সামাজিক উৎসব হচ্ছে জামাই ষষ্ঠী ও ভাইফোঁটা। অরণ্যষষ্ঠীর দিনই জামাই ষষ্ঠী। ওই দিনে জামাইকে নিমন্ত্রণ করে শ্বশুরবাড়ি আনা হয় ও শাশুড়ী ঠাকরুণ জামাইকে 'বাটা' প্রদান করেন। এছাড়া, জামাইকে বিশেষ যত্ন করে আপ্যায়ন করা হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসে জামাই যেমন নিমন্ত্রিত হয়ে শ্বশুরবাড়ি আসেন, কার্তিক মাসে তেমনই জামাই নিমন্ত্রণ করে শ্যালক-সম্বন্ধীদের তাঁর বাড়ি নিয়ে আসেন ও তাদের আদর-আপ্যায়ন করে খাওয়ান। বোন ওইদিন ভাইদের কপালে চুয়ার ফোঁটা দিয়ে বলে– 'ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা, যমের দুয়ারে যেন পড়ে কাঁটা' জামাইষষ্ঠীতে জামাইকে 'বাটা' দান ও ভাইফোঁটার দিন ভাইয়ের কপালে ফোঁটা দেওয়া সব বারে হয় না। কতকগুলো বার বর্জন করা হয়। বলা বাহুল্য এই দুই অনুষ্ঠানেই পুরোহিতের কোন ভূমিকা নেই। মেয়েরাই এতে অংশ গ্রহণ করে।

অগ্রহায়ণ মাসে প্রতি রবিবার মেয়েরা যে ইতুপূজা করে, তা-ও পুরোহিত ব্যতিরেকে মেয়েরাই করে থাকে। এটাও যে আদিম সমাজ থেকে গৃহীত হয়েছে তা ইতুর ঘট ও ইতুপূজা সম্পর্কে যে উপাখ্যান আছে, তাতে উমনো-ঝুমনো, এই দুটি নাম থেকেই প্রকাশ পায়।

বাঙালী হিন্দু বিধবার পক্ষে অবশ্য পালনীয় একটা ব্রত হচ্ছে অম্বুবাচী। আষাঢ় মাসের সাত তারিখ থেকে তিন দিন অম্বুবাচীর কাল ধরা হয়। ওই তিন দিন কোন বিধবা রন্ধন করেন না ও অগ্নিপক্ক কোন খাদ্য গ্রহণ করেন না। অম্বুবাচী মানে বর্ষার সূচনা। নববর্ষকে অভিনন্দিত করবার জন্য ওই তিনদিন চাষবাস বন্ধ রাখা হয়। ওই তিনদিন পৃথিবী রজঃস্বলা হয়। বাঙালী কৃষকদের তাই বিশ্বাস।

॥ চার ॥

অরন্ধন ও পৌষপার্বণ এ দুটো ছিল গ্রাম বাঙলার

আনন্দময় উৎসব। অরন্ধনের দিন মেয়েরা প্রকাশ করত তাদের রন্ধনক্রিয়ার দক্ষতা। এই উপলক্ষে আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের নিমন্ত্রণ করে আগের দিনের রান্না-করা নানা পদের খাদ্যসামগ্রী তারা অভ্যাগতদের রসনার তৃপ্তি সাধন করত। আর পিঠে ছিল বাঙলার গৌরবময় ঐতিহ্যের নিদর্শন। পৌষপার্বণে মেয়েরা প্রদর্শন করত তাদের পিঠে তৈরির শিল্পচাতুর্য। সাধারণত সুগন্ধি আতপ চাউলের গুঁড়া, দুধ, ক্ষীর, নারিকেল, আর ভাল খেজুরের গুড় প্রভৃতি দিয়ে পিঠে তৈরি করা হত। নানা প্রক্রিয়ায় ও বিচিত্র ছাঁদে পিঠে প্রস্তুত করা হত। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সমাজেই এটা প্রচলিত ছিল। পঞ্চাশ বছর আগে পর্যন্ত পূর্ববঙ্গের মুসলমান সমাজে বিয়ের পর নতুন জামাই যখন প্রথম শ্বশুর বাড়ি আসত, তাকে আপ্যায়িত করা হত নানা রকমের পিঠে দিয়ে। অন্তত চল্লিশ-পঞ্চাশ রকমের পিঠে তৈরি করা হত। রন্ধন ক্রিয়া ও পিঠে তৈরির এই নৈপুণ্য মেয়েরা ক্রমশ হারিয়ে ফেলছে। অথচ উত্তর ভারত বনাম বাঙলার এটাই ছিল এক বিশেষ ঐতিহ্য।

যখন অমরা চিন্তা করি যে বাঙলা নদীবহুল ও পলিমাটির দেশ, তখন বাঙলার অর্থনীতিতে কৃষির প্রাধান্য আমরা সহজেই বুঝতে পারি। এজন্য বাঙলা দেশের সকল জাতির (ব্রাহ্মণ পর্যন্ত—চণ্ডীমঙ্গল কাব্য অনুযায়ী) লোকই কৃষিকর্মে লিপ্ত থাকত। বাঙলার কৃষিজাত ফসলের মধ্যে ধানই শীর্ষস্থান অধিকার করত। বস্তুত ধানের চাষ অস্ট্রিক গোষ্ঠীভূক্ত জাতি-সমূহের দান। চাউল যে বাঙালী নিজেই খায় (ভাত, মুড়ি, খই, চিড়ে ইত্যাদি রূপে) তা নয়, তার দেবতাকেও সে নিবেদন করে। চাল-কলা না হলে ঠাকুরের নৈবেদ্য হয় না। বিহার ও উত্তরভারতে যবচূর্ণ ব্যবহৃত হয়। নবান্ন, পৌষপার্বণ ইত্যাদি বাঙালীর পাল-পার্বণও চালের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। আবার এই চালের পিটুলি করে তা দিয়ে বাঙালী প্রকাশ করে আলপনা রেখাচিত্রে তার নান্দনিক মননশীলতা।

কদলী বা কলাও অস্ট্রিক যুগ থেকে বাঙালীর প্রিয় খাদ্য। সেজন্য বাঙালী কলা নিবেদন করে তার দেবতাকে। আখের চাষ ও গুড়ের উদ্ভবও বাঙলা দেশেই হয়েছিল। পুণ্ড্রবর্ধনে এক বিশেষ জাতের আখ জন্মাত, যার নাম ছিল 'পৌণ্ড্রক'। এখন এই জাতের আখ ভারতের অন্যত্রও উৎপন্ন হয়। এবং

তার মৌলিক নাম অনুযায়ী তাকে 'পৌড়িয়া', 'পুড়ি' ও 'পৌড়া' নামে অভিহিত করা হয়। 'গৌড়' শব্দটাও 'গুড়' শব্দ থেকে উদ্ভুত। পাণিণি বলেছেন– 'গুড়স্য অয়ং দেশ গৌড়া।'

এটা সহজেই অনুমেয় যে, কৃষিপ্রধান অর্থনীতিতে কৃষির উপযোগী নানারূপ যন্ত্রাদি তৈরি করা হত। তাম্রাশ্মযুগে এসব যন্ত্রপাতি তামা বা পাথর দিয়ে তৈরি করা হত। পরে এগুলি লৌহনির্মিত হতে থাকে। রাঢ় দেশের অরণ্য অঞ্চলে লৌহ উৎপাদন হত। এ-সকল অঞ্চলে বহু লোহার খনি ছিল এবং এই সকল অঞ্চলের লোকরা লৌহ উৎপাদন প্রণালীর সঙ্গে সম্যকভাবে পরিচিত ছিল। বস্তুত বীরভূম ও বর্ধমান জেলায় - উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদ পর্যন্ত দেশজ প্রণালীতে লৌহ উৎপাদন হত ও তা দিয়ে মুঘল ও ইংরেজ আমলে কামান তৈরি করা হত। বিষ্ণুপুরের 'দলমাদল' কামান তার নিদর্শন। বস্তুত ধাতুশিল্পে বাঙালীর দক্ষতা ছিল অসামান্য। তার প্রমাণ আমরা পাই ঢোকরাদের ধাতু শিল্পের নিখুঁত নৈপুণ্যে, ও স্বর্ণকারদের সোনা ও রূপার অলঙ্কার নির্মাণে। এছাড়া ধাতুশিল্পিরা তৈরি করত বাসন-কোশন ও গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় অনেক কিছু জিনিস।

বাঙালীর আরও অনেক মৌলিক শিল্প ছিল। তার মধ্যে হচ্ছে কার্পাস ও রেশম জাতীয় বস্ত্রাদি, যা বহন করত বাঙালী মণীষার গৌরবময় ঐতিহ্যের স্বাক্ষর। প্রতি ঘরে ঘরে সুতা কাটা হত। মাটির দেশ বাঙলায় মাটি দিয়ে তৈরি করা হত পুতুল, যার মধ্যে প্রকাশ পেত অসামান্য সজীবতা। এই শিল্পেরই অন্তর্ভূক্ত ছিল বাঙালীর প্রাণের দেবতাগণের প্রতিমা গঠন ও পোড়ামাটির মন্দির সজ্জা, যাতে রূপায়িত হয়ে আছে নানা পৌরাণিক কাহিনী ও সামাজিক দৃশ্য। পটচিত্রও বাঙলার লৌকিক শিল্পের আর এক অবদান। পটে চিত্রিত করা হত নানারূপ পৌরাণিক কাহিনী, দেবদেবীর মূর্তি পাপ-পূণ্যের পরিণাম ও নানারূপ বিষয়বস্তু। এর সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট ছিল লক্ষ্মী-সরা তৈরি, যা দিয়ে বাঙালী তার শ্রী-সমৃদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মীকে পূজা করত। 'ছউ' নাচের মুখোশ ও দশাবতার তাস-ও বাঙালীর লোক-সংস্কৃতির আর এক নিদর্শন। বাঙালীর নান্দনিক মননশীলতা আরও প্রকাশ পেত শাঁখের ও হাতির দাঁতের অলঙ্কারে, শোলার কাজে, কাঠ-খোদাইয়ের কাজে, গালার কাজে ও আরও কত কি শিল্পে যা

তার দৈনন্দিন জীবন যাত্রাকে সার্থক করে তুলত। মেয়েদের অনুশীলিত আলপনা, বিবাহের জন্য 'শ্রী'-গঠন, কেশ-বিন্যাস ও নকশী কাঁথা ইত্যাদি বহন করত তাদের সৌন্দর্য বোধের স্বাক্ষর। বস্তুত বাঙালীর লৌকিক শিল্পসমূহে অনুষ্ঠিত হত তাদের প্রাণের স্পন্দন ও আনন্দময় জীবনচর্চা। (লেখকের 'ফোক্ এলিমেন্টস্ ইন বেঙ্গলী লাইফ', দ্রষ্টব্য)।

॥ পাঁচ ॥

অষ্ট্রিক যুগ থেকেই বাঙালীর লৌকিক জীবনে স্থান পেয়েছিল নানারূপ ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়া। এখনও বাঙালী যদি দেখে রাস্তার তেমাথায় কেউ রেখে গিয়েছে সরা করে জবা ফুল ইত্যাদি, তাহলে সে তা অতিক্রম করে না বা তার ত্রিসীমানায় ঘেঁষে না। শনি-মঙ্গলবারে রাত্রিকালে বাঙালী মেয়েরা অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় বা ছেলে কোলে করে কখনও নিমগাছের বা বেলগাছের তলা দিয়ে যায় না। তাদের বিশ্বাস অপদেবতার দৃষ্টি লাগবে। গ্রামের লোক এখনও বিশ্বাস করে 'নিশিডাক'-এ। সেজন্য রাত্রিকালে কেউ কারুর নাম ধরে তিনবারের বেশি না ডাকলে কখনও উত্তর দেয় না। বাঙালী বিশ্বাস করে যে 'বাদুলে' (বৃষ্টির দিনে যার জন্ম) ছেলে-মেয়ের বিয়ের দিন-এ নিশ্চয়ই বৃষ্টি হবে। পাছে বিয়ের আনন্দ নষ্ট হয়, সেজন্য বৃষ্টি এড়াবার জন্য মেয়েরা হয় বাটনাবাটার শিল উলটো করে উঠানে স্থাপন করে, আর তা নয়তো কারুর বাড়ি থেকে একটা তৈজসপত্র না বলে নিয়ে এসে লুকিয়ে রাখে। তাদের বিশ্বাস এরূপ করলে আর বৃষ্টি হবে না। বাচ্ছা ছেলে মেয়ে দুধ তুললে গ্রামাঞ্চলের মেয়েরা বিশ্বাস করে 'নজর' লেগেছে এবং তার জন্য জলপড়া খাওয়ায়। এছাড়া, গ্রামাঞ্চলের লোকের মনে ভুতপ্রেতের ভয় বিলক্ষণ। রাত্রিকালে আলগা (অনাচ্ছাদিত) জায়গায় কখনও ছেলেদের জামা-কাঁথা ইত্যাদি টাঙিয়ে রাখে না, পাছে অপদেবতার 'নজর' লাগে। তাছাড়া, 'ভুতে-পাওয়া' ব্যাপারও আছে। ভুতে পেলে 'রোজা' ডাকা হয়। 'রোজা' ভুত ছাড়িয়ে দেয়। বাঙালীর লৌকিক জীবনে 'রোজা', 'গুণিন', 'ডাইনি' ইত্যাদির ভূমিকা এক সময় খুব বেশি ছিল। যাঁরা প্যারীচাঁদ

মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' পড়েছেন, তাঁরা জানেন ঠকচাচা এ বিষয়ে সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

সাপে কামড়ালেও 'রোজা' ডাকা হয়। 'রোজা'র ক্ষমতা আছে সাপের বিষ ঝাড়বার। শুনেছি যে-সাপ লোকটাকে কামড়েছে, সেই সাপটা নাকি রোজার সামনে এসে হাজির হয়। এছাড়া, কিছু চুরি গেলে বাঙালী বাটি-চালা, চালপড়া, নখদর্পণ ইত্যাদির আশ্রয় নেয়। বাটিচালার বাটি নাকি অপরাধীর কাছে গিয়ে হাজির হয়। চালপড়াতে যে চুরি করেছে, তার থুতুর সঙ্গে রক্ত দেখা দেয়। নখদর্পণে কালি-লাগানো বুড়া আঙুলের নখের মধ্যে অপরাধীকে দেখা যায়।

॥ ছয় ॥

এছাড়া বাঙলার লৌকিক জীবনে স্থান পেত, যা এখনও গ্রামাঞ্চলে (শহরের কোন কোন শ্রেণীর মধ্যেও) পায়, বশীকরণ, স্তম্ভন, বিদ্বেষণ, উচ্চাটন, মারণ ইত্যাদিতে বিশ্বাস। এ সবের প্রক্রিয়া ও মন্ত্রাদি বিশদভাবে বর্ণনা করা আছে আমার 'ফোক্ এলিমেন্টস্ ইন বেঙ্গলী লাইফ' বইয়ে। এসব মন্ত্রাদি পর্যালোচনা করলে দেখতে পাওয়া যাবে এগুলো সবই প্রাক্-আর্যকালের ভাষায় রচিত।

আর্য-পুরোহিতরা কোন কোন ক্ষেত্রে, আদিম যুগের এসব প্রক্রিয়াকে যে অনুসরণ করেছিল সেটা 'অথর্ববেদ' পড়লে বুঝতে পারা যায়। তাছাড়া, শান্তি-স্বস্ত্যায়ন ইত্যাদি সেই আদিম যুগের পদ্ধতিরই ফলশ্রুতি। এছাড়া, বিরুদ্ধ গ্রহের প্রশমনের জন্য কয়েকটি গাছের মূল, ধাতু ও রত্নও ব্যবহার করা হয়। কতকগুলি বীজমন্ত্র নির্দিষ্ট সংখ্যক বার প্রতিদিন জপ করার ব্যবস্থাও আছে। এগুলির ভাষা থেকেই বুঝতে পারা যাবে এগুলির কোনটাই মৌলিক আর্য-সংস্কৃতির অবদান নয়।

বলা বাহুল্য, বাঙালীর লৌকিক জীবনে এই সকল ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়া বা পদ্ধতি, আদিম সমাজ কর্তৃক অনুসৃত 'সদৃশ-বিধানী' ও 'সংস্পর্শ -বিধানী, ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত। আদিম সমাজে 'সদৃশ-বিধানী' ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়া দ্বারা সদৃশ উদ্দেশ্য সাধন করা হত। যেমন কারুকে

মারতে হলে, তার একটা মৃন্ময় পুত্তলিকা তৈরি করে তার বুকে একটা কাঁটা ফুটিয়ে দেওয়া হয়। তাদের বিশ্বাস এর ফলে শত্রু বিনষ্ট হবে। আর 'সংস্পর্শ-বিধানী' ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়ায় যার অনিষ্ট করতে হবে, তার ব্যবহৃত কোন জিনিস (যেমন শাড়ির একটা কোন্ বা ছেলের কাঁথার একটা অংশ) এনে, তার ওপর ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়া প্রয়োগ করলে তার অনিষ্ট হবে।

বাঙালীর লৌকিক জীবনে তুলসীর প্রভাব খুব বেশি। বাঙালীর কাছে তুলসী গাছ অত্যন্ত পবিত্র। বাঙালীরা মনে করে তুলসী যেখানে থাকে, হরিও সেখানে থাকে। সেজন্য বাঙালী বাড়িতে তুলসী মঞ্চ তৈরি করে। তুলসী পাতা না হলে নারায়ণের পূজা হয়না। শ্রাদ্ধাদি কাজও হয় না। আবার তুলসীপাতা না হলে 'মৃতে দোষপ্রাপ্তি' কাটানো যায় না। শপথ করতে গেলেও তামা ও তুলসীর দরকার হয়। মুমূর্ষুকে তুলসী-তলায় শোয়ানো হয়। বৈষ্ণবরা আবার তুলসী কাঠের কণ্ঠী ব্যবহার করে। তুলসীর এই মাহাত্ম্যের জন্য তুলসীতলা পরিষ্কার রাখা হয় ও সন্ধ্যাবেলায় প্রদীপ দেওয়া হয়। কিন্তু সধবা মেয়েরা তুলসীপাতা তোলে না কেন ? উত্তর ঠিক জানি না। তবে মনে হয় পৌরাণিক উপাখ্যানে তুলসীর সতীত্বনাশের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক থাকতে পারে।

ভাদ্রমাসের চতুর্থী তিথিকে 'নষ্টচন্দ্র' বলা হয়। ওইদিন চাঁদ দেখা নিষিদ্ধ কেননা পৌরাণিক কাহিনী অনুযায়ী ওইদিন চন্দ্র গুরুপত্নীকে ধর্ষণ করেছিলেন। ওইদিন গৃহস্থের বাড়ি থেকে ফলমূল চুরি করার প্রথা আছে। কেউ এটা দোষ মনে করে না।

কার্তিক মাসে আকাশ প্রদীপ দেওয়ার প্রথা ছিল। চৈত্রমাসে সংক্রান্তিতে যবের ছাতু খাবার নিয়ম ছিল। এসব প্রথা এখন উঠে গেছে। আরও উঠে গেছে দেওয়ালীর দিন 'আঁজিপুজি' করা ও পৌষ সংক্রান্তিতে 'বাউনি' দেওয়া।

সবশেষে কয়েকটি লৌকিক দেবতার কথা বলব। এদের মধ্যে আছে টুসু, ভাদু, বারামুন্ড, কালুরায়, গাজী, বনবিবি, ক্ষেত্রপাল, বাস্তুঠাকুর, দক্ষিণরায় প্রভৃতি। টুসু ও ভাদুর পূজার কথা পরবর্তী এক অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। বারা ধরহীন মনুষ্য মূর্ত্তি; আর দক্ষিণরায় বাঘ বা ঘোড়ায় চাপা দিব্য দেবতা মূর্তি। বারার পূজা হয় চব্বিশ পরগণায় পৌষ সংক্রান্তি বা পয়লা মাঘ, বনে বা নদীর ধারে বা গাছতলায় বা

ক্ষেতের আলে। অনেক জায়গায় এক পুরুষ—বারার পাশে, এক জলঘটকে স্ত্রী—বারার প্রতীক হিসাবে রাখা হয়। আবার অন্যত্র স্ত্রী-পুরুষ যুগ্মমূর্ত্তি স্থাপন করা হয়। এটা যে জাদুবিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত লৌকিক উর্বরতা বা সু-ফলন বর্ধক পূজা সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

॥ সাত ॥

বাঙালীর লৌকিক জীবনকে আনন্দময় করে রেখেছিল তার নিজস্ব খেলাধুলা ও আমোদ-প্রমোদ। ঘরের বাইরের খেলার মধ্যে ছিল কাবাডি, কুস্তি, লাঠিখেলা, সাঁতার, নৌকার বাইচ ইত্যাদি। আর ঘরের ভিতরের খেলার মধ্যে ছিল দাবা, পাশা, গুটিখেলা, দশ-পচিঁশ, কড়ি খেলা ও তাসের বিন্তি ও রঙের খেলা। এছাড়া ছেলেমেয়েরা খেলত লুকোচুরি, কানামাছি, এককা-দুককা ইত্যাদি।

আমোদ-প্রমোদের মধ্যে লৌকিক জীবনে স্থান পেত যাত্রা, পুতুল নাচ, ভোজবাজী ইত্যাদ্দি। এছাড়া ছিল নানারকমের সংগীত অনুষ্ঠান ও কথকতা। বাঙালীর সমস্ত লৌকিক জীবনটাই ছিল গানে ভরা। ছেলে হলে মেয়েরা গান গাইত। গান গেয়ে মায়েরা ছেলেদের ঘুম পাড়াতো। বিয়ে বা অন্য অনুষ্ঠানেও মেয়েরা গান গাইত। মরে গেলে লোককে শ্মশান ঘাটে নিয়ে যাওয়া হত সংকীর্তন গান গেয়ে। তারপর তার শ্রাদ্ধের সময়ও কীর্তন করা হত।

মধ্যযুগে বাঙালীর লৌকিক জীবনে পালাগান খুব জনপ্রিয় ছিল। এ-সকল পালাগান গাওয়া হত মনসা, ধর্মঠাকুর, শিব, গম্ভীরা, শীতলা, চণ্ডী, কৃষ্ণলীলা, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতিকে আশ্রয় করে। রাতের পর রাত এ-সকল পালাগান গ্রামবাসীদের মুগ্ধ করে রাখত। পালা গান ছাড়া, পাঁচালী গানও খুব জনপ্রিয় ছিল।পাঁচালী গানে মূল গায়েন পায়ে নুপুর পরে ও এক হাতে চামর ও অপর হাতে মন্দিরা নিয়ে, নাচতে নাচতে গান করত। পাঁচালী গানের নিজস্ব ছন্দ ও রচনাশৈলী ছিল। এছাড়া গ্রাম্য জীবনে ছিল কথকতা। কথক ঠাকুর নিজ আসনে বসে পৌরাণিক কাহিনীসমূহ বিবৃত করতেন, আর মাঝে মাঝে গান গাইতেন। বলা বাহুল্য, নিরক্ষর গ্রামবাসীরা

এ সবের মাধ্যমেই প্রাচীন ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত হত।

অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙলায় কবিগানও খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। কবিগানের উৎপত্তি সম্বন্ধে একাধিক মত আছে। এক মত অনুযায়ী এগুলো বৈষ্ণব পদাবলী থেকে উদ্ভুত হয়েছিল। অন্যমত অনুযায়ী সাধারণের মধ্যে প্রচলিত ঝুমুর ও ধামালী গান থেকে উদ্ভুত। অষ্টাদশ শতাব্দীর কবিওয়ালাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিল গোঁজলা গুঁই, লালু, নন্দলাল, রামজী, রঘুনাথ দাস, কেষ্ট মুচি, রাসু নৃসিংহ, হারু ঠাকুর, বলাই বৈষ্ণব, নীলমণি ঠাকুর, নিত্যানন্দ দাস বৈরাগী, অ্যান্টনী ফিরিঙ্গি, ভোলা ময়রা, ভবানী ঠাকুর প্রমুখ। কবিগান ছিল গানের লড়াই। এতে দুই পক্ষ যোগদান করত। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ হাফ-আখরাই গানের অভ্যুদয়ের পর কবিগানের জনপ্রিয়তা হ্রাস পায়। বাঙালীর লৌকিক জীবনে 'তরজা' গানেরও জনপ্রিয়তা ছিল। তরজাও গানের লড়াই। এতে এক পক্ষ প্রশ্ন করত, অপর পক্ষ তার উত্তর দিত—সবই গানের মাধ্যমে।

যাত্রাভিনয়েরও খুব জনপ্রিয়তা ছিল। যাত্রাভিনয়ের মধ্যে থাকত কথোপকথন ও গান। এর জন্য কোনও মঞ্চ তৈরি হত না। মাটির ওপরই কাপড় বিছিয়ে আসর তৈরি করা হত। বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্যন্ত কলকাতার লোকের কাছে যাত্রাভিনয় বেশ আকর্ষণীয় ব্যাপার ছিল। তারপর থিয়েটারের চাপে যাত্রাভিনয় গ্রামের আস্তানার মধ্যেই নিবদ্ধ হয়ে পড়ে। গ্রামের জমিদাররাই এর পৃষ্ঠপোষক ছিল। কিন্তু জমিদারি বিলোপের পর যাত্রাভিনয়ের জনপ্রিয়তা গ্রামে কমে গিয়েছে। এখন যাত্রাভিনয়কে আধুনিকীকরণ করা হয়েছে। কিন্তু এতে না আছে আগেকার দিনের যাত্রার পরিবেশ, না আছে তার রেশ। আগে পুরুষরাই মেয়ে সেজে মেয়েদের ভূমিকা অভিনয় করত। এখন মেয়েরাই মেয়েদের ভূমিকা গ্রহণ করে।

## ॥ আট ॥

বাঙলার এক বিরাট মৌখিক সাহিত্য ছিল। যদিও ছাপাখানার দৌলতে এ-সাহিত্য আজ মুদ্রিত রূপ পেয়েছে, এক

কালে অবশ্য মুখে মুখেই এর পরম্পরা রক্ষিত হত। এ-সাহিত্যের দু'টা অঙ্গ ছিল—(১) জ্যোতিষিক ছড়া যথা – খনা ও ডাকের বচন, ও (২) দেবদেবীর মাহাত্ম্য ও প্রচারের কাহিনী। যত দেবতা তত কাহিনী। প্রথমেই ধরা যাক লক্ষ্মীর কাহিনী। একদিন নারায়ণের ইচ্ছা হল পৃথিবীর লোকরা কিভাবে আছে, তা নিজের চোখে দেখতে যাবেন। লক্ষ্মীঠাকরুণ তাঁকে ধরে বসলেন তিনিও সঙ্গে যাবেন। শর্ত হল পৃথিবীতে অবতরণের পর লক্ষ্মীঠাকরুণ উত্তর দিকে তাকাবেন না। কিন্তু কৌতুহল-বশত লক্ষ্মী উত্তরদিকে তাকিয়ে তিলফুল দেখে মোহিত হয়ে কয়েকটা তিলফুল তুলে আনলেন। ব্রাহ্মণ ক্ষেত্রস্বামীর বিনা অনুমতিতে তার ক্ষেত্র থেকে ফুল তোলার পাপের জন্য নারায়ণ বললেন, 'এর জন্য তোমাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে, তিন বছর ওঁর গৃহে দাসীবৃত্তি করে। সেদিন থেকেই ব্রাহ্মণ পরিবারের ঐশ্বর্য বাড়তে লাগল, এবং তারা লক্ষ্মীর প্রতি বিশেষ যত্নবান হল। জয়মঙ্গলবারের কাহিনীতে মঙ্গলচণ্ডীর কৃপায় জয়াবতী নানা বিপদ্ বিপত্তি ও বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা পেলেন। অরণ্যষষ্ঠীর কাহিনীতে ছোট বউ ষষ্ঠীর কৃপায় তার মৃত সাত ছেলে ফিরিয়ে পেল। ইতু পূজার কাহিনীতে বড় বোন ঝুমনোর পরামর্শে ছোট বোন উমনো নানারকম অঘটন থেকে রক্ষা পেল। শিবরাত্রির কাহিনীতে বারাণসীর এক ব্যাধ শিকারে বেরিয়ে রাত্রি হওয়ায় এক বৃক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করে। গাছ তলাতে এক শিবলিঙ্গ ছিল। বেলপাতাসহ গাছ থেকে এক বিন্দ শিশির কণা মহাদেবের মাথায় পড়ে। শিব তুষ্ট হন ও ব্যাধ শিবলোকে যান্।

অঞ্চলভেদে এসব কাহিনীর পার্থক্য আছে। তাছাড়া পরবর্তী কালে রচিত নূতন কহিনী আদিম কাহিনীকে চাপা দিয়েছে। এসকল অলিখিত সাহিত্যের উপাখ্যান সমূহের রূপভেদ বিশেষভাবে লক্ষ্য করি গন্ধেশ্বরী পূজার কাহিনীসমূহে। গন্ধেশ্বরী হচ্ছেন গন্ধবণিক জাতির দেবতা। গন্ধেশ্বরী তাদের শত্রু গন্ধাসুরকে বধ করেছিল বলেই গন্ধবণিক সমাজ তার পূজা করে। কিন্তু গন্ধেশ্বরী পূজার উদ্ভব সম্বন্ধে অন্য বহু কাহিনী প্রচলিত আছে। এইসব উপাখ্যানের একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে উপাখ্যানের মধ্যে অলৌকিক ঘটনার সন্নিবেশ। বাঙালী হিন্দু এসব কাহিনীর অলৌকিকত্বে বিশ্বাস করত! সেই কারণেই হিন্দুর নৈতিক মান খুব উচ্চস্তরে ছিল। আজ

হিন্দু সে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে। সঙ্গে সঙ্গে তার মন থেকে পাপপুণ্যের বিশ্বাসও লোপ পেয়েছে। সেজন্যই হিন্দুর নৈতিক মান আজ নিম্নস্তরে গিয়ে পৌঁছেছে।

# পরিবার ও বিবাহ

পরিবারই সমাজের সবচেয়ে ন্যূনতম সংস্থা। পরিবার গঠিত হয় স্বামী-স্ত্রী ও তাদের সন্তান-সন্ততিদের নিয়ে। যদিও উনবিংশ শতাব্দীর কোন কোন পণ্ডিত যথা বাখোফেন, মরগান প্রমুখেরা বলতেন যে মনুষ্যসমাজে প্রথমে কোন স্থায়ী যৌনসম্পর্ক ছিল না, তা হলেও বর্তমানে এটা সর্ববাদীসম্মত সত্যরূপে পরিগণিত হয়েছে যে মানুষের আবির্ভাবের দিন থেকেই পরিবার গঠিত হয়ে এসেছে। সন্তানকে লালনপালন ও স্বাবলম্বী করে তোলবার জন্য মানুষের যে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয়, একমাত্র এই জীববিজ্ঞানজনিত কারণই এ-কথা প্রমাণ করবার পক্ষে যথেষ্ট সহায়ক যে মনুষ্য সমাজে গোড়া থেকেই পরিবার গঠন প্রচলিত ছিল। মহাভারতে বিবৃত শ্বেতকেতু কাহিনীও প্রমাণ করে যে শ্বেতকেতু কর্তৃক বিবাহ-প্রথা প্রচলিত হবার আগেই শ্বেতকেতু পিতামাতার সঙ্গে পরিবার মধ্যে বাস করত। (লেখকের 'ভারতের বিবাহের ইতিহাস' দ্রঃ)।

॥ দুই ॥

বাঙলায় দু'রকমের সমাজ-ব্যবস্থা আছে – আদিবাসীর সমাজ-ব্যবস্থা ও হিন্দুর সমাজ-ব্যবস্থা। বলা বাহুল্য, উভয়রকম সমাজ-ব্যবস্থাতেই পরিবার হচ্ছে ন্যূনতম সামাজিক সংস্থা। আদিবাসীদের মধ্যে কয়েকটি পরিবার নিয়ে গঠিত হয় একটি গোষ্ঠী বা দল (clan)। আবার কয়েকটি গোষ্ঠী বা দলের সমষ্টি নিয়ে গঠিত হয় একটি উপজাতি বা 'ট্রাইব' (tribe)। হিন্দুদের মধ্যে ট্রাইবের পরিবর্তে আছে বর্ণ কিংবা জাতি।

ট্রাইব ও জাতির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এগুলি অন্তর্বিবাহের (endogamous) গোষ্ঠী। তার মানে কেউ নিজ জাতি বা ট্রাইবের বাইরে বিবাহ করতে পারে না। বিবাহ করতে হলে জাতি বা ট্রাইবের ভেতরেই বিবাহ করতে হবে। তবে জাতি বা ট্রাইবের ভেতরে যে-কোন মেয়েকে অবাধে বিয়ে করতে পারে না। এ-সম্বন্ধে উভয় সমাজেই খুব সুর্নির্দিষ্ট নিয়মকানুন আছে।

আগেই বলা হয়েছে যে জাতি বা ট্রাইবগুলি কতকগুলি গোষ্ঠী বা দলে বিভক্ত। এইসকল গোষ্ঠী বা দলগুলির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বহির্বিবাহ (exogamy)। তার মানে কোন গোষ্ঠীর কোন ছেলে যদি বিয়ে করতে চায়, তবে তাকে বিয়ে করতে হবে অন্য গোষ্ঠীর মেয়েকে। হিন্দুদের মধ্যে বহির্বিবাহের গোষ্ঠীগুলি চিহ্নিত হয় গোত্র-প্রবর দ্বারা, আর আদিবাসী সমাজে এগুলি চিহ্নিত হয় টোটেম (totem) দ্বারা। টোটেম বলতে গোষ্ঠীর রক্ষকস্বরূপ কোন শুভসাধক পরমাত্মাকে বোঝায়। এই পরমাত্মা কোন বৃক্ষ, প্রাণী বা জড়পদার্থের মধ্যে নিহিত থাকে। একই টোটেমের ছেলেমেয়েরা কখনও পরস্পরকে বিয়ে করতে পারে না। তাকে অপর কোন টোটেমে বিয়ে করতে হবে।

হিন্দুদের মধ্যে বহির্বিবাহের গোষ্ঠীগুলি চিহ্নিত হয় গোত্র-প্রবর দ্বারা। ব্রাহ্মণদের মধ্যে এগুলি আখ্যাত হয় কোন পূর্বপুরুষ ঋষির নামে। ব্রাহ্মণেতর জাতিদের মধ্যে কুলপুরোহিতের গোত্রই অবলম্বিত হয়।

হিন্দুসমাজে অবাধ-বিবাহের অপর এক প্রতিবন্ধকতা আছে। সেটা হচ্ছে রক্তের একমূলতা সম্পর্কিত দ্বি-পার্শ্বিক 'সপিণ্ড' বিধি। এই বিধান অনুযায়ী সপিণ্ডদের মধ্যে কখনও বিবাহ হয় না। সপিণ্ড বলতে পিতৃকুলে উর্ধ্বতন সাত-পুরুষ ও মাতৃকুলে উর্ধ্বতন তিন পুরুষ বোঝায়। আগেকার দিনে গোত্র-প্রবর বিধি ছাড়া অবাধ-বিবাহের আর এক বাধা ছিল সেটা হচ্ছে কৌলিন্যপ্রথা। (পরে দ্রঃ)।

## ॥ তিন ॥

কিছুকাল আগে পর্যন্ত বাঙালী সমাজে যে পরিবার প্রচলিত ছিল, তাকে 'যৌথ' বা একান্নবর্তী পরিবার বলা হত। এর

পরিধি ছিল অতি-বিস্তৃত। এই পরিবারের মধ্যে বাস করত কোন ব্যক্তি স্বয়ং ও তার স্ত্রী ও পুত্র-কন্যা, তার বাবা-মা, খুড়ো-খুড়ী, জ্যেঠা-জ্যেঠী ও তাদের সকলের ছেলে-মেয়েরা, তার ভাইয়েরা ও তাদের স্ত্রীরা ও ছেলেমেয়েরা। অনেকসময় এই পরিবারভুক্ত হয়ে আরও থাকত কোন বিধবা পিসি বা বোন বা অন্য কোন দুঃস্থ আত্মীয় ও আত্মীয়া। যোগাযোগ ও পরিবহনের সুবিধা হবার পর মানুষ যখন কর্মোপলক্ষে স্থানান্তরে গিয়ে বসবাস শুরু করল, তখন থেকেই বাঙলার এই সনাতন পরিবারের ভাঙন ঘটল। এখন ছেলেরা মা-বাপ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে। এক ছেলে থাকে চন্দননগরে, আর এক ছেলে চেতলায়, আর এক ছেলে সিঁথিতে, ও আরও এক ছেলে দিল্লীতে। আবার অনেক সময় বাপ-মা থাকে কলকাতায়, আর তাদের ছেলেমেয়েরা থাকে বিদেশে, আমেরিকা বা বিলাতে। এক কথায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাঙালীর সনাতন পদ্ধতিতে গঠিত যৌথ বা একান্নবর্তী পরিবার ভেঙে গিয়েছে। বর্তমানে সরকার যে-সব 'হাউসিং এস্টেট' তৈরি করছেন, যে-সব হাউসিং এস্টেটের ফ্লাটগুলিও এ-রকম পরিবারের বাসোপযোগী করেই তৈরি করা হচ্ছে। সরকারী আইনের প্রভাবে বাঙলার গ্রামাঞ্চলেও ওই একই ব্যাপার ঘটেছে। খামারের উর্দ্ধতন আয়তনসীমা বেঁধে দেওয়ার ফলে, বড় বড় খামারগুলো বিভক্ত হয়েছে এবং মালিকানা স্বত্ব আগেকার যৌথ পরিবারের হাত থেকে পরিবারের বিভিন্ন সদস্যদের হাতে চলে গিয়েছে। এর ফলে আগেকার যৌথ পরিবার ভেঙে গিয়ে, ছোট ছোট ব্যষ্টিগত পরিবারের সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া যৌথ পরিবারের সদস্যদের মধ্যে আত্মকলহও যৌথ পরিবারকে ভেঙ্গে ফেলেছে। মারা পড়েছে বিধবা পিস্বি-বোন-ও-দুঃস্থ-আত্মীয়-আত্মীয়ারা যারা আগেকার দিনে যৌথ পরিবারের মধ্যে একটা স্থান বা আশ্রয় পেত। এতে যে মাত্র যৌথ পরিবারের, তা নয়, সমগ্র সমাজের সংহতি নষ্ট হয়েছে।

॥ চার ॥

মাত্র পরিবারের ক্ষেত্রেই যে পরিবর্তন ঘটেছে তা নয়।

বিবাহের ক্ষেত্রেও আমূল পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে। বাঙালীর বিবাহ ছিল অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। মাত্র যমরাজাই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাতে পারতেন। একবার এরূপ বিচ্ছেদ ঘটলে স্বামী ইচ্ছা করলে আবার দ্বিতীয়বার বিবাহ করতে পারতেন। কিন্তু বিধবা স্ত্রীর পক্ষে তা সম্ভবপর ছিল না। তাকে কঠোর ব্রহ্মচর্য ও কৃচ্ছ্রসাধন করতে হত। পদস্খলিতা হলে হিন্দুসমাজ থেকে সে বিতাড়িতা হত। তখন বাধ্য হয়ে তাকে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হতে হত, কেননা মুসলমান সমাজে সে উপপতির গৃহে বিবির আসন পেত। হিন্দুসমাজ এভাবে ক্ষীয়মাণ হচ্ছে দেখে রঘুনন্দন সামান্য প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা এরূপ মেয়েদের হিন্দুসমাজে পুনরায় প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা করেছিলেন, কিন্তু তাঁর সে প্রয়াস বিশেষ ফলবতী হয়নি। অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাজা রাজবল্লভ বিধবা বিবাহের জন্য প্রয়াসী হয়েছিলেন, কিন্তু রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের প্রতিকূলতা তাঁর সে প্রয়াসকে বিনষ্ট করেছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগরের সহমর্মিতা এ বিষয়ে সার্থকতা লাভ করে এবং ১৮৫৬ খীষ্টাব্দে সরকার বিধবা বিবাহ আইন প্রণয়ন করেন। বিধবা বিবাহ আইন সিদ্ধ করার পদাঙ্কে সরকার উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে বিবাহ সম্বন্ধে আরও দুটি আইন প্রণয়ন করেন। ১৮৭২ খীষ্টাব্দের তিন নম্বর আইন দ্বারা স্ববর্ণে বিবাহের বাধা দুর করা হয়। তবে এই আইন অনুযায়ী বিবাহ করতে হলে, বিবাহেচ্ছু উভয়পক্ষকেই শপথ গ্রহণ করতে হত যে, 'তারা হিন্দু নয়'। কিন্তু ১৯২৩ সালের ৩০ নম্বর আইন দ্বারা বিধান দেওয়া হয় যে অহিন্দু বলে ঘোষনা না করেও অসবর্ণ বিবাহ করতে পারা যায়। তবে এই আইন প্রণয়নের পূর্বেই এরূপ একটি বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। সেটা হচ্ছে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মেয়ে অপর্ণা দেবীর বিবাহ। এ-সম্বন্ধে অপর্ণা দেবী নিজেই লিখেছেন—'১৯১৬ সালে আমার বিয়েই বাঙলা দেশে হিন্দুশাস্ত্রানুসারে প্রথম অসবর্ণ বিয়ে।'

১৮৭২ খীষ্টাব্দে অসবর্ণ বিবাহ আইন প্রণয়নের পর ১৮৯১ খীষ্টাব্দে ফুলমণির শোকাবহ দুর্ঘটনার পর, বিবাহে সঙ্গমের বয়সও বেঁধে দেওয়া হয়। এ-সম্বন্ধে 'এজ অভ্ কনসেন্ট' আইন বিধিবদ্ধ করা হয়।

বিংশ শতাব্দীর ২০-এর দশকে রায় বাহাদুর হরবিলাস সরদা বদ্ধপরিকর হন বাল্যবিবাহ রোধ করবার জন্য। ১৯২৯

খ্রীষ্টাব্দের ২৯ নম্বর আইনে নির্দেশ দেওয়া হয় যে, হিন্দু বিবাহে পাত্রের উপযুক্ত বয়স ন্যূনপক্ষে ১৮ ও মেয়ের বয়স ১৫ হওয়া চাই। (পরে সংশোধনী আইন দ্বারা ২১ ও ১৮ করা হয়েছে)। হিন্দু বিবাহ সংস্কারের জন্য দুটি বড় রকমের আইন বিধিবদ্ধ করা হয় ১৯৪৬ খীষ্টাব্দে। ওই বৎসর ১৯ নম্বর আইন দ্বারা স্ত্রীকে অধিকার দেওয়া হয় অবস্থা বিশেষে স্বামীত্যাগের জন্য। স্বামী যদি কুৎসিত ব্যাধিতে ভোগে, বা স্ত্রীর প্রতি এমন নিষ্ঠুর ব্যবহার করে যে স্ত্রীর নিরাপত্তার অভাব ঘটে, বা স্বামী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে, বা আবার স্ত্রী গ্রহণ করে, বা নিজগৃহে রক্ষিতা এনে রাখে, বা ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, বা ধর্মান্তর গ্রহণ করে, তাহলে ওই আইনের বলে স্ত্রী স্বচ্ছন্দে স্বামীত্যাগ করে স্বতন্ত্র বসবাস করতে পারবে। আর ২৮ নম্বর আইনে নির্দেশ দেওয়া হয়, স্বগোত্রে ও সমপ্রবরে 'বিবাহও বৈধ। স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৪৯ খীস্টাব্দের ২১ নম্বর আইন দ্বারা বিবাহ ক্ষেত্রে জাতিগত, বর্ণগত, শ্রেণীগত ও সম্প্রদায়গত যতরকম বাধা-বৈষম্য ছিল, তা দূরীভূত করা হয়।

বিবাহ সম্বন্ধে শেষ আইন (সংশোধনী আইন ছাড়া) বিধিবদ্ধ হল ১৯৫৫ খীস্টাব্দে। এটাই হচ্ছে হিন্দুবিবাহ সম্পর্কে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আইন। এই আইনটিকে 'হিন্দু বিবাহ বিধি' বা ১৯৫৫ সালের ২৫ নম্বর আইন বলা হয়। এই আইন দ্বারা হিন্দুর একাধিক বিবাহ নিষিদ্ধ করা হয়েছে ও স্ত্রী আদালতের কাছে বিবাহ-বিচ্ছেদের জন্য প্রার্থনা করতে পারে। ১৯৭৬ সালে ভারতীয় সংসদ যে সংশোধক আইন প্রণয়ন করেছেন, তাতে হিন্দু বিবাহ আইনের ১৬ ধারায় ও স্পেশাল ম্যারেজ অ্যাক্টের ২৬ ধারায় বিবৃত অসিদ্ধ ও বাতিলযোগ্য বিবাহকে আইনত সিদ্ধ বিবাহ বলে 'ধরে নিয়ে', তাদের সন্তানকে বৈধ করা হয়েছে, তবে তার পিতামাতার দাম্পত্য সম্পর্ককে বৈধ করা হয়নি।

## ॥ পাঁচ ॥

একশ বছর আগে পর্যন্ত বাঙালীর সমাজ-জীবনে কৌলীন্য প্রথা একটা জঘন্য ব্যাপার ছিল। এটা মধ্যযুগের ব্রাহ্মণ

সমাজেই উদ্ভূত হয়েছিল। পরে অন্যান্য জাতিরাও এটাকে অনুকরণ করেছিল। বাঙলা দেশের ব্রাহ্মণদের মধ্যে এই প্রথানুযায়ী কুলীনগোষ্ঠীভূক্ত মেয়ের বিবাহ কুলীনগোষ্ঠীতে দেওয়া একান্ত বাধ্যতামূলক ছিল। হীনতর মর্যাদাবিশিষ্ট গোষ্ঠীতে বিয়ে দিতে পারা যেত না। দিলে তাকে 'পতিত' হতে হত। সেজন্য কন্যার বিবাহের জন্য পাত্র পাওয়া অত্যন্ত দুষ্কর ছিল। অনেক সময় বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত কুলীনকন্যার বিবাহ হত না। এই কারণে কোন কোন স্থানে শিশুকন্যা হত্যার প্রচলন ছিল। আবার কোন কোন স্থলে কুলীন ব্রাহ্মণদের মধ্যে পাইকারী হারে বহুবিবাহ দ্বারা কৌলীন্যের কঠোর বিধান এড়ানো হত। এরূপ শোনা যায় যে, কোন কোন ক্ষেত্রে গঙ্গাযাত্রী কুলীন বৃদ্ধের সঙ্গে কুলীন কন্যার বিবাহ দিয়ে কৌলীন্য-মর্যাদা রক্ষা করা হত। অনেকস্থলেই কুলীন কন্যারা পিতৃগৃহে থেকে যেত। এরূপ সমাজে যে-সব মেয়েদের যৌনক্ষুধা প্রবল, তাদের ক্ষেত্রে যা ঘটত, তা সহজেই অনুমেয়। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রামনারায়ণ তর্করত্ন ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সেটা খোলাখুলিভাবেই বলেছিলেন। এ-সম্বন্ধে রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটকের চতুর্থ অঙ্কের এক দৃশ্য বিশেষ কৌতুকবহ। ওই দৃশ্যের এক সংলাপ আমি নীচে উদ্ধৃত করছি।

"পুত্র ঃ– হ্যাঁ এক প্রকার অমঙ্গলই বটে, সেথায় আমার একটি মেয়ে হয়েছে। তার অন্নপ্রাশনের নিমিত্ত আমার সম্বন্ধী আমাকে সেথায় যেতে লিখেছে; দোকানী বেটাত এই বল্লো।

পিতা ঃ– আহা কন্যা হল। পুত্র সন্তান হলে ভাল হতো। ঈশ্বরের ইচ্ছা, এ ত অন্যের সাধ্য নয়, তা কি কর্ব্বো, বাপু, যাও অন্নপ্রাশন দেও গে।

পুত্র ঃ– বাবা। তার নিমিত্তে বলছিনা।

পিতা ঃ– তবে কি নিমিত্ত ?

পুত্র ঃ– কি বলবো বাবা, লজ্জা হয়, সে দেশে প্রায় তিন বছর যাই নাই, তাই বলি মেয়েটা হল।

পিতা ঃ– (উচ্চহাস্য করিয়া) বাপুহে। তাতে ক্ষতি কি। আমি তোমার জননীকে বিবাহ করিয়া তথায় একবারও যাই নাই, একেবারে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। তা বাপু আমরা কুলীনের ছেলে, আমাদের ও রকম হয়ে থাকে, তাতে ক্ষতি কি ? যাও বাপু। তারা আমোদ করে লিখেছে, যাও লজ্জা

কি ?”

ওই একই দৃশ্যে উত্তম মুখোপাধ্যায় নামে এক ব্যক্তি ওই পিতাকে জিজ্ঞাসা করছে।

“উত্তম ঃ– মহাশয়ের নাম কি ?

পিতা ঃ– আমার নাম শ্রী বিবাহবনিক মুখোপাধ্যায়।

উত্তম ঃ– তবে আমি প্রণাম করি (প্রণিপাত)।

পিতা ঃ– বাপু, তুমি কে আমাকে প্রণাম করিতেছ ?

উত্তম ঃ– আমি মহাশয়ের পুত্র। আমার নাম উত্তম মুখোপাধ্যায়।”

এইসব বলার পর উত্তম বলছে, “আমি আজ কৃতার্থ হইলাম, জন্মাবধি পিতৃদর্শন পাই নাই।” পিতা (স্বগত) তুমি দর্শন পাবে কি, তোমার মাও আমাকে কখনও দেখে নাই।– সেই শুভদৃষ্টি মাত্রই।”

বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁর ‘বহুবিবাহ’ গ্রন্থে লিখেছেন “কোন কারণে কুলীন মহিলার গর্ভসঞ্চার হইলে, তাহার পরিপাকার্থে কন্যাপক্ষীয়দিগকে ত্রিবিধ উপায় অবলম্বন করিতে হয়। প্রথম, সবিশেষ চেষ্টা ও যত্ন করিয়া জামাতার আনয়ন। তিনি আসিয়া শ্বশুরালয়ে অবস্থিতি করিয়া প্রস্থান করেন। ঐ গর্ভ তৎসহযোগে সম্ভূত বলিয়া পরিগণিত হয়। দ্বিতীয় জামাতার আনয়নে কৃতকার্য হইতে না পারিলে, ব্যভিচার সহচরী ভ্রূণহত্যা দেবীর আরাধনা। এ অবস্থায়, এতদ্ব্যতিরিক্ত নিস্তারের আর কোন পথ নাই। তৃতীয় উপায় অতি সহজ, অতি নির্দোষ ও সাতিশয় কৌতূকজনক। তাহাতে অর্থব্যয়ও নাই, এবং ভ্রূণহত্যা দেবীর উপাসনাও করিতে হয় না। কন্যার জননী, অথবা বাটির অপর গৃহিণী, একটি ছেলে কোলে করিয়া, পাড়ায় বেড়াইতে যান, এবং একে একে প্রতিবেশীদিগের বাটি গিয়া, দেখ মা, দেখ বোন, অথবা দেখ বাছা, এইরূপ সম্ভাষণ করিয়া, কথা প্রসঙ্গে বলিতে আরম্ভ করেন, অনেকদিনের পর কাল রাত্রিতে জামাই আসিয়াছিলেন; হঠাৎ আসিলেন, রাত্রিকাল, কোথায় কি পাব; ভাল করিয়া খাওয়াতে পারি নাই; অনেক বলিলাম, একবেলা থাকিয়া, খাওয়া-দাওয়া করিয়া যাও; তিনি কিছুতেই রহিলেন না, বলিলেন, আজ কোন মতে থাকিতে পারিব না; সন্ধ্যার পর অমুক গ্রামের মজুমদারদের বাটিতে একটা বিবাহ করিতে হইবে; পরে অমুকদিন অমুক গ্রামের হালদারের বাটিতেও

বিবাহের কথা আছে; সেখানেও যাইতে হইবেক। যদি সুবিধা হয়, আসিবার সময় এই দিক দিয়া যাইব। এই বলিয়া ভোর ভোর চলিয়া গেলেন। স্বর্ণকে বলিয়াছিলাম, ত্রিপুরা ও কামিনীকে ডাকিয়া আন, তারা জামায়ের সঙ্গে খানিক আমোদ আহ্লাদ করিবে। একলা যেতে পারিব না বলিয়া ছুঁড়ি কোন মতেই এল না। এইরূপে পরে স্বর্ণমঞ্জরীর গর্ভ সঞ্চার প্রচার হইলে, ঐ গর্ভ জামাতাকৃত বলিয়া পরিপাক পায়।" রামনারায়ন ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লেখার ফলে কৌলীন্যপ্রথার বিলুপ্তি ঘটে।

॥ ছয় ॥

বলাবাহুল্য গত দেড়শ বছর যাবৎ সরকার চেষ্টা করেছেন আইন-প্রণয়ন দ্বারা হিন্দু বিবাহকে মর্যাদা দিয়ে বিবাহিতা নারীর স্বার্থরক্ষার জন্য। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বিবাহিতা হিন্দু নারী আজও সামাজিক ও পারিবারিক নিষ্ঠুরতা ও অবিচারের হাত থেকে নিষ্কৃতিলাভ করতে সক্ষম হয়নি। সংবাদপত্রে প্রতিদিন বধূনিধনের যে-সকল সংবাদ বেরুচ্ছে, তা থেকে প্রমাণ হয় যে সমাজ থেকে পণপ্রথাঘটিত পাপ, অত্যাচার ও নিষ্ঠুরতা এখনও দূরীভূত হয়নি। আজও মেয়েরা পণের বলি হয়ে আছে।

# বিবাহের আচার-অনুষ্ঠান

বাঙালী হিন্দুর বিবাহের আচার-অনুষ্ঠান সমূহকে দু'ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে— শাস্ত্রীয় ও লৌকিক। বিবাহ সম্বন্ধে সমস্ত আচার-অনুষ্ঠান ও উৎসব পালন করতে তিনদিন সময় লাগে। শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানসমূহের অন্তর্ভূক্ত হচ্ছে বিবাহের দিন (১) মধ্যাহ্নে পিতৃপুরুষগণের নিকট বিবাহে শুভকামনায় নান্দীমুখ বা বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করা, ও (২) রাত্রে বিবাহ বাসরে বেদমন্ত্র উচ্চারণ করে বিবাহ কার্য সম্পাদন করা, সপ্তপদীগমণ ও কনের সিঁথিতে সিন্দুরদান। (যেখানে কুশণ্ডিকা আছে সেখানে পরদিন কুশণ্ডিকা অনুষ্ঠানে সিন্দুরদান করা হয়)। শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান পুরোহিত দ্বারা সম্পাদিত হয়। লৌকিক আচার-অনুষ্ঠানসমূহ সধবা মেয়েদের ও নাপিত দ্বারা সম্পাদিত হয়।

॥ দুই ॥

বাঙালী হিন্দুর বিবাহে স্ত্রী-আচার ও নাপিতের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেজন্য মনে হয় ব্রাহ্মণ্যধর্মের অনুপ্রবেশের পূর্বে নাপিত দ্বারাই বিবাহ সম্পাদিত হত।

মেয়েলি সমাজে পুরোহিত কর্তৃক অনুষ্ঠিত ধর্মীয় আচারের চেয়ে স্ত্রী-আচারের ওপর বেশি জোর দেওয়া হয়। তাদের বিশ্বাস এ-গুলির কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটলে বর-কনে উভয়েরই অমঙ্গল ঘটবে। এগুলির যে ঐন্দ্রজালিক প্রভাব আছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। স্ত্রী-আচার গুলির উদ্দেশ্য হচ্ছে বিবাহের পূর্বে যত-রকম বাধা-বিপত্তি ঘটতে পারে সেগুলিকে

প্রতিহত করা। আর পুরোহিত কর্তৃক সম্পাদিত অনুষ্ঠানগুলির উদ্দেশ্য হচ্ছে বিবাহের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ককে পবিত্র করা। এ-সময় মৃত পূর্বপুরুষদের আত্মার শান্তি কামনা করা হয় ও দেবতাদের প্রসন্নতা প্রার্থনা করা হয়।

বিবাহের দ্বারা স্ত্রীলোকের কুলসম্পর্কের চ্যুতি ঘটে। গোত্র দ্বারাই হিন্দুদের মধ্যে কুলসম্পর্ক সূচিত হয়। বিবাহের পর স্ত্রীলোককে পিতৃকুলের গোত্র পরিহার করে স্বামী কুলের গোত্র গ্রহণ করতে হয়। সেজন্য হিন্দুনারীর পক্ষে বিবাহ-জীবনের সূচনা চরম সন্ধিক্ষণ। এরূপ সন্ধিক্ষণে যাতে কোন বাধা বিপত্তি না ঘটে, তার উদ্দেশ্যেই স্ত্রী-আচার সমূহ পালিত হয়।

আচার-অনুষ্ঠানগুলির একটা সামাজিক উদ্দেশ্যও আছে। বর-কনের মধ্যে যে বিবাহ ঘটছে এবং সে বিবাহ যে অবৈধ নয়, সাধারণের মধ্যে তার প্রচার ও প্রকাশ করাও এ-সকল আচার অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য।

## ॥ তিন ॥

বাঙালী হিন্দু বিবাহের উৎসব তিনদিনের। বিবাহ উপলক্ষে পিঁড়িতে বিশেষ আলপনা দেওয়া হয় ও একটি 'শ্রী' তৈরি করা হয়। বিয়ের তিনদিন আবশ্যিকভাবে বরকে একটি জাঁতি ও কনেকে একটি কাজললতা বহন করতে হয়। তাছাড়া, প্রথমদিন বিবাহ সম্পাদন না হওয়া পর্যন্ত বর ও তার মাকে উপবাসী থাকতে হয়। পূর্ববঙ্গে অনুষ্ঠান শুরু হয় মঙ্গলাচরণ, অধিবাস, নিদ্রাকলস, দধিমঙ্গল ইত্যাদি দিয়ে। পশ্চিমবঙ্গে শুরু হয় কলাতলায় ক্ষৌরকর্মের পর গাত্রহরিদ্রা দিয়ে। পাঁচ বা সাত জন সধবা স্ত্রীলোক বরের কপালে তেল-হলুদ ছুঁইয়ে সেই তেল-হলুদ নাপিত মারফৎ পাঠিয়ে দেয় কনের বাড়ি। সঙ্গে যায় গায়ে-হলুদের তত্ত্ব। ওই তেল হলুদ কনের কপালে ঠেকানো হয়।

মধ্যাহ্নের পর বর ও কনের বাড়িতে এক শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান হয়। একে আভ্যুদয়িক বা নান্দীমুখ বলা হয়। এর উদ্দেশ্য পিতৃপুরুষদের প্রীতিসাধন করে তাঁদের আশীর্বাদ কামনা করা। বিকালে স্নানের পর সাজগোজ করে, বর টোপর মাথায়

দিয়ে কলাতলায় এসে দাঁড়ায়, মায়ের আশীর্বাদ অনুষ্ঠানের জন্য। মা ছেলেকে তিনবার জিজ্ঞাসা করে, 'বাবা, কোথায় যাচ্ছ?' ছেলে উত্তর দেয়, 'মা আমি তোমার জন্য দাসী (আজকাল বলে 'বৌ') আনতে যাচ্ছি'। ছেলে একখানা থালায় করে আতপ চাউল ও একটা টাকা মায়ের আঁচলে ঢেলে দেয়। একে বলা হয় 'কনকাঞ্জলি'। তারপর বর বিবাহ অনুষ্ঠানের জন্য কনের বাড়ি যাত্রা করে। কনের বাড়ি থেকে যখন খবর আসে যে বিয়ে হয়ে গিয়েছে, তখন মা 'কনকাঞ্জলি'র চাল ফুটিয়ে অন্ন তৈরি করে, তাই খেয়ে উপবাস ভঙ্গ করে। বরের সঙ্গে কনের বাড়ি যায় 'নিতবর' বা 'মিতবর', নাপিত, পুরোহিত ও বরকর্তা। যাবার সময় মেয়েরা উলুধ্বনি দেয় ও শাঁখ বাজায়। এদের অনুসরণ করে বরযাত্রীর দল।

এদিকে কনের বাড়িতে কলাতলার কাজের পর, কনেকে স্নান, প্রসাধন ও সাজগোজ করানো হয়। তারপর তাকে একখানা লাল-রঙের শাড়ি পরিয়ে একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে একটা পিঁড়ির ওপর বসিয়ে রাখা হয়। ইতিমধ্যে কনের বাড়িতে 'হাই-আমলা' বাটা হয়। একখানা বাটনা বাটবার শিলকে উলটো করে পেতে দুজন সধবা স্ত্রীলোক পরস্পরের দিকে পা ছড়িয়ে দিয়ে সামনা সামনি হয়ে বসে হাই-আমলা (আমলকী ও অন্যান্য দ্রব্য বেনের দোকানে পাওয়া যায়) বাটে। এছাড়া, ছাদনাতলায় ব্যবহারের জন্য দু'গাছা ছড়ি সংগ্রহ করা হয়। একখানা কুলোর উল্টো পিঠে ধুতুরা ফলকে চিরে ২১ টি প্রদীপ তৈরি করে সাজানো হয়। এছাড়া মোনা-মুনি ভাসানো ইত্যাদি মেয়েলি আচারগুলি সম্পাদন করা হয়। একটি জলের গামলায় বা হাঁড়িতে মোনামুনি ভাসানো হয়। ওই গামলায় বা হাঁড়িতে মোনামুনি ছেড়ে দেওয়া হয়। এগুলো ভাসতে ভাসতে যদি এক জায়গায় গিয়ে মিলিত হয়, তবে ধরে নেওয়া হয় বর-কনের দাম্পত্যজীবন সুখের হবে। নচেৎ নয়।

বরের গাড়ি কনের বাড়ি গিয়ে পৌঁছলে, মেয়েরা শাঁখ বাজায়, উলুধ্বনি দেয় ও বরের গাড়ির তলায় এক ঘড়া জল ঢেলে দেয়। তারপর বরকে হাত ধরে নিয়ে এসে আসরে বসানো হয়। বরপক্ষীয় লোকরাও সেখানে বসে। 'আশীর্বাদ' অনুষ্ঠান যদি আগে না হয়ে থাকে, বরকনের আশীর্বাদও তখন হয়।

বিবাহ-লগ্নের কিছু আগে বরকে বিবাহ-মণ্ডপ বা কক্ষে নিয়ে আসা হয়। বর বস্ত্র পরিবর্তন করে কন্যাপক্ষের দেওয়া কাপড় পরে। বিবাহ-কক্ষে কিছু মন্ত্রপাঠের পর বরকে ছাদনাতলায় নিয়ে আসা হয়। কনের বাড়ির কলাতলাই হল ছাদনাতলা। ছাদনাতলার অনুষ্ঠানের কর্ণধার হচ্ছে নাপিত। ছাদনাতলার কাজ শুরু হবার আগে জ্যেষ্ঠ জামাতাকে কিছু কাপড়-চোপড় ও উপহার দেওয়া হয়। একে বলা হয় 'জামাইবরণ'। তারপর সধবারা বরণডালা, ধুতুরার প্রদীপ ইত্যাদি নিয়ে এসে সেখানে স্ত্রী-আচার সমূহ সম্পাদন করে। তাদের কার্য সম্পন্ন হলে পিঁড়ির ওপর উপবিষ্ট ও পান দিয়ে মুখঢাকা অবস্থায় কনেকে বহন করে নিয়ে আসা হয়। বরকে বেষ্টন করে কনেকে সাতবার ঘোরানো হয়। বর ও কনের মাঝখানে একখানা লাল-পাড় কাপড় দিয়ে আড়াল করে রাখা হয়। এবার ছড়ি দুখানা নিয়ে নাপিত বলে, 'বর বড় না কনে বড় ?' উত্তর আসে 'বর বড়'। তারপর বরকনের মাঝখানে যে লালপাড় কাপড়খানা আড়াল করা ছিল, সেখানা তুলে বর-কনের মাথার ওপর ঢাকা দেওয়া হয়। তখন বর-কনে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে "শুভদৃষ্টি" করে। নাপিত এ-সময় ছড়া কাটে–

"শুন সবে, এবে আমি করি নিবেদন।
ছাঁদনাতলায় এসেছে বর বৃষভ বাহন॥
মন্দলোক থাক যদি, যাও, সরে যাও।
ছাউনি নাড়ার সময় হল, এয়োরা দাঁড়াও॥
খুঁটি খাটা ছেড়ে দাও, ভাতার পুতের মাথা খাও।
যে ধরবে চালের বাতা সে খাবে ভাতারের মাথা।
যে জন করবে 'কু' তার 'বাপের মুখে গু॥'
কড়ি দিয়ে কিনলাম, দড়ি দিয়ে বাঁধলাম।
হাতে দিলাম মাকু, ভ্যা করত বাপু॥"

তারপর বরকনেকে আবার বিবাহ কক্ষে নিয়ে আসা হয়। সেখানে সম্প্রদানের জন্য পুরোহিত কর্তৃক বেদমন্ত্রপাঠ, হোমাদি ও 'বসুধারা' ক্রিয়া হয়। তারপর বর একটা (চাউল মাপার) 'রেক'– এর সাহায্যে কনের সিঁথিতে 'সিঁদুর দান' করে। ওখানেই 'গাঁটছড়া বাঁধা' হয়। বিবাহ কার্য এখানেই সম্পন্ন হয়ে যায়। বিবাহকার্য সম্পন্ন হয়ে গেলে, বর-কনেকে বাসরঘরে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে জল-যোগাদির পর

শ্যালিকার দল বা ঠাকুরমা-দিদিমার দল বরকে নিয়ে সমস্ত রাত্রি ঠাট্টা-তামাশা করে।

সকালে বর-কনে যাবার আগে শ্যালিকারা 'সেজ-তোলানি', 'নোনদ-ভোলানি' ইত্যাদি বাবদ বরের কাছ থেকে কিছু টাকা আদায় করে নেয়। পল্লীগ্রামে 'গ্রামভাটি'র চাঁদাও দিতে হয়।

বর কনেকে নিয়ে নিজের বাড়ি পৌঁছালে মেয়েরা শঙ্খধ্বনি ও উলুধ্বনি দেয়। বরের মা বা অন্য কেউ গাড়ির তলায় ঘড়া থেকে জল ঢেলে দেয়। আগেকার দিনে কনেকে কোলে করে গাড়ি থেকে নামানো হত। আজকাল কনে নিজেই নামে। বাড়ির প্রবেশ পথে কনেকে একটা 'ল্যাটা' মাছ থালার ওপর ধরতে বলা হয়। একটা ভাঁড়ে দুধ ফোটানো হয়। দুধ ফুটে উঠলে শুভ বলে মনে করা হয়।

তারপর বরের ছোটভাই বর-কনের পথ রোধ করে। ছোট ভাই জিজ্ঞাসা করে, 'দাদা, বল, আমার বিয়ে দেবে তো ?' বর বলে, 'হ্যাঁ দেব।' তখন ছোট ভাই পথ ছেড়ে দেয়। তারপর বর-কনে ঘরে গিয়ে বসলে, মেয়েরা বর-কনেকে নিয়ে 'কড়ি খেলা' খেলে।

সেদিন কালরাত্রি। সেদিন বর-কনে আর পরস্পরের সান্নিধ্যে আসে না। পরের দিন দুপুরে হয় পাকস্পর্শ। কনে বরের আত্মীয়স্বজনের পাতে পরমান্ন দেয়। এটাই সামাজিক স্বীকৃতি যে তার স্পৃষ্ট অন্ন সকলে গ্রহণ করবে। রাতে ফুলশয্যা। কনের বাড়ি থেকে ফুলশয্যার তত্ত্ব আসে। প্রীতিভোজ হয়। রাত্রে ফুলশয্যা হয়, তার মানে সেদিনই বর-কনে একশয্যায় শয়ন করে। এখানেই বিয়ের অনুষ্ঠান শেষ। তবে এরপর কয়েকদিনে হয় দ্বিরাগমণ, সত্যনারায়ণ ও সুবচনীর পূজা, মুঙ্গলি হাঁড়ি ঢাকা ইত্যাদি।

॥ চার ॥

আদিবাসী-সমাজেও বাঙলার বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে বিবাহ বিষয়ক আচার-অনুষ্ঠানের বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। তবে হিন্দুদের তুলনায় আদিবাসী সমাজের আচার-অনুষ্ঠান অনেক পরিমাণে সরল, সংক্ষিপ্ত ও আড়ম্বরহীন। বিবাহ

সাধারণত একদিনেই সমাপ্ত হয়। যেহেতু আমাদের প্রতিবেশী সাঁওতালরা ভারতে সংখ্যাগরিষ্ঠ আদিবাসী, সেই হেতু সাঁওতালদের বিবাহের আচার-অনুষ্ঠানের বর্ণনাই এখানে দিচ্ছি। সাঁওতালদের মধ্যে বরপণ নেই। মাত্র কন্যাপণই আছে। কন্যাপণের টাকা মেয়ের বাবা, মা, ঠাকুরমা বা দিদিমাকে দিতে হয়। এখন অনেক জায়গায় টাকার পরিবর্তে মেয়ের মা, ঠাকুরমা ও দিদিমাকে শাড়ি দিতে হয়। সাঁওতাল সমাজে বরের বাবাকেই মেয়ে খুঁজতে হয়, মেয়ের বাবাকে নয়। মেয়ে খোঁজবার কাজটা সমাধা করে ঘটক (সাঁওতালী ভাষায় 'রায়বার')। রায়বার কনে খুঁজে বের করলে, বরপক্ষ গ্রামের 'জগমাঝি'র সাহায্যে মেয়ে দেখতে যায়। মেয়ে পছন্দ হলে কন্যাপক্ষ বরের গ্রামে গিয়ে তার ঘরবাড়ি দেখে আসে। তারপর শুভদিনে বরকে আশীর্বাদ করা হয় ও কন্যাপক্ষকে পণ দেওয়ার কাজ সারা হয়। বিয়ের দিন ধার্য হলে একটা বিবাহমণ্ডপ তৈরি করে পূর্বপুরুষদের নামে 'হাঁড়িয়া' উৎসর্গ করা হয়। তারপর দেবতাদের উদ্দেশ্যে তিনটি মুরগি উৎসর্গ করা হয় ও মণ্ডপের মাঝখানে গর্ত খুঁড়ে তিন টুকরো কাঁচা হলুদ, কয়েকটি আতপ চাউল ও দুর্বাঘাস আমপাতায় মুড়ে সুতা দিয়ে বেঁধে সেই গর্তে রাখা হয়। একটি মহুয়াগাছের ডালও সেখানে পোঁতা হয় এবং সেই ডালটিকে খড়ের মোটা দড়ি দিয়ে বেঁধে তার গায়ে আতপচালের গুঁড়া দিয়ে আলপনা দেওয়া হয়।

সাঁওতাল সমাজে 'গায়ে হলুদ' দেবার প্রথা প্রচলিত আছে। এতে অংশ গ্রহণ করে বরের বৌদি ও তিনটি অনূঢ়া মেয়ে। এরা ছাড়া, আরও অংশ গ্রহণ করে গ্রামের নায়কে, পুরোহিত ও অন্যান্য অনূঢ়া মেয়েরা। সঙ্গে সঙ্গে নাচগান হয়। কনের বাড়িতেও ঠিক এইভাবে 'গায়ে-হলুদ' হয়। গায়ে-হলুদের তেল-হলুদ বরের বাড়ি থেকে কনের বাড়ি পাঠানো হয়। গায়ে-হলুদ হয়ে গেলে আত্মীয়স্বজনকে নিয়ে 'আইবুড়োভাত' খাওয়া হয়। আত্মীয়স্বজন সকলেই নূতন বস্ত্র উপহার পায়। তারপর গ্রামের ছেলেমেয়েরা নাচগান করে 'বিবাহমণ্ডপ জাগান' অনুষ্ঠান করে। আর জগমাঝি (সহকারী মাঝি) পাড়ার ছেলেমেয়েদের নিয়ে 'জলবিবাহ' অনুষ্ঠান সমাধা করে।

সাঁওতালদের বিবাহ (বাঙালী হিন্দুদের মত) মেয়ের

বাড়িতে হয়। বরকে নিয়ে যাত্রা করবার পূর্বে বরের বাবা গৃহদেবতা ও পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে 'হাঁড়িয়া' উৎসর্গ করে এবং বরের ও বরযাত্রীদের (সাঁওতাল সমাজে এদের 'বারিয়াত' বলা হয়) মঙ্গল কামনা করে। তারপর কনের বাড়ির সীমানায় পৌছালে, সেখানকার ছেলেরা লাঠিসোঁটা নিয়ে যুদ্ধের মত অঙ্গভঙ্গী করে নাচগান করে। তারপর বরকে বিবাহমণ্ডপে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে বরকে স্নান করানো হয়। স্নানের পর বরের ভগ্নীপতি বরকে কাঁধে করে নিয়ে আসে। অনুরূপভাবে কনের ভাইকেও কাঁধে করে তুলে আনা হয়। বর কনের ভাইয়ের সঙ্গে আলাপ করে ও পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা ও প্রীতির চিহ্ন স্বরূপ আলিঙ্গন করে।

তারপর কনেকে একটা বড় ডালায় করে আনা হয়। বর-কনে পরস্পরের গায়ে আতপ চাউল ছোঁড়ে ও আমডালের পাতা দিয়ে পরস্পরের গায়ে জলের ছিটে দেয়। বিবাহমণ্ডপ তিনবার প্রদক্ষিণ করবার পর বর কনের সিঁথিতে সিঁদুর দেবার জন্য শালপাতায় মোড়া সিঁদুর বের করে। বর বসুধারাকে স্মরণ করে ও সূর্যদেবকে সাক্ষী রেখে কনের সিঁথিতে তিনবার সিন্দুর লেপে দেয়। এই সময় কনের বড় বোন গাঁটছড়া বেঁধে দেয়। তারপর কনের মা বর বরণ করে বরকে ঘরে তুলে নিয়ে যায়। কনের মা বর-কনের মুখে তেল-হলুদ মাখিয়ে দেয় ও বরের কানের গোড়ায় সিঁদুরের ফোঁটা ও কনের সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে দেয়। বর-কনেও মায়ের মুখে তেল-হলুদ মাখিয়ে দেয়। তারপর নানারকম স্ত্রী-আচার চলে।

বিদায়ের দিন কনের বাড়িতে নাচগান ও খাওয়া-দাওয়া চলে। শুভমুহূর্তে বাপ-মা মেয়েকে বিদায় দেয়। বিদায়ের পর বরযাত্রী ও কন্যাযাত্রী সবাই একসঙ্গে বর-কনের সঙ্গে যায়। গ্রামের সীমানায় পৌঁছে তারা অপেক্ষা করে। সেখানে সকলকে আপ্যায়ণ করবার জন্য বরের বাড়ি থেকে খাবার-দাবার আসে। একে 'ধুড়ি জলাউরি দাকা' বলা হয়।

কিছুক্ষণ পরেই বরের মা ও মাতৃস্থানীয়ারা এসে বর-কনের হাত-মুখ ধুইয়ে মিষ্টিমুখ করিয়ে যায়। তারপর বরের বাড়ি থেকে খবর এলে বর-কনে গ্রামে প্রবেশ করে। যাবার পথে প্রতি বাড়ি থেকেই তাদের গুড়-জল খাওয়ানো হয়। তারপর আবার কিছু স্ত্রী-আচার হয়। তারপর বর-কনে স্নান করে।

স্নান করার পর তারা গ্রামের নায়কে, মাঝি, পারাণিক ও আত্মীয়স্বজন সকলের পা ধুইয়ে দেয় এবং তাদের প্রণাম করে। কনে ভাশুরেরও পা ধুইয়ে দেয় এবং ভাশুর কনের ডান হাতের কনুইতে জল ঢেলে দেয় এবং কনেও ভাশুরের ডান হাতের কনুইতে জল ঢেলে দেয়। তারপর থেকে নববধূ ভাশুরকে তার যোগ্য সম্মান প্রদর্শন করতে থাকে।

সেদিন সারাদিনই বাড়িতে নাচগান চলে। রাতে প্রীতিভোজ ও সুরাপান হয়। এখানেই বিবাহের সমাপ্তি ঘটে। তবে সাঁওতাল সমাজে আরও অনেক বর্গের বিয়ের প্রচলন আছে। যথা (১) ভাব করে বিবাহ, (২) অর-ইতুৎ-বাপলা বিবাহ, ও (৩) ঘরদি যাওয়াল বাপলা বিবাহ। ঘরদি যাওয়াল বাপলা বিবাহ হচ্ছে ঘর-জামাই বিবাহ। আর অর-ইতুৎ-বাপলা বিবাহ হচ্ছে সিঁদুর-ঘষা বিবাহ। সিঁদুর ঘষা বিয়েতে হাটে বা বাজারে পাত্র মেয়ের কপালে জোর করে সিঁদুর ঘষে দেয় এবং জোর করে তাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে যায়। এরূপ বিবাহও সিদ্ধ বিবাহ এবং মেয়ে না চাইলেও তাকে বরের সঙ্গে ঘর করতে হয়, কেননা সিঁদুর-ঘষা মেয়েকে সমাজে আর কেউ বিয়ে করে না।

# সমাজ ও জাতি

একেবারে সূচনায় বাঙলার সমাজ সংগঠন উত্তরভারতের আর্যসমাজ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ছিল। এটা সকলেরই জানা আছে যে ব্রাহ্মণ্যধর্মের অনুপ্রবেশ বাঙলা দেশে খুব বিলম্বে ঘটেছিল। সেজন্য ব্রাহ্মণ্যধর্মের অনুপ্রবেশের পূর্বে বাঙলায় চাতুর্বর্ণ্য সমাজ ছিল না; ছিল কৌমসমাজ ও বিভিন্ন বৃত্তিধারী জাতিগোষ্ঠীর সমাজ। বাঙলার জনপদগুলি এই সকল কৌমজাতির নামেই অভিহিত হত। এই সকল কৌমজাতির অন্যতম ছিল পুণ্ড্র, বঙ্গ, কর্বট প্রভৃতি। মনে হয় এই পুণ্ড্রদের বংশধররাই হচ্ছে পোদ (বর্তমান নাম পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়) জাতি। অনুরূপভাবে এটাও অনুমেয় যে, বর্তমান কৈবর্তজাতি কর্বট-কৌমের বংশধর। এইসব জাতি ছাড়া প্রাচীন বাঙলায় আরও ছিল বাগদি জাতি। এছাড়া, আরও ছিল হাড়ি, ডোম, বাউরি প্রভৃতি জাতির পূর্বপুরুষরা। প্রাচীন গ্রীক লেখকদের রচনাবলী থেকে আমরা জানতে পারি যে, মৌর্যদের সময় পর্যন্ত বাগদিরাই রাঢ়দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতি ছিল। কৈবর্তদের উল্লেখ মনুর 'মানবধর্মশাস্ত্র'—এ আছে। মনু এদের বর্ণসঙ্কর বলে অভিহিত করেছেন। পালরাজাদের সময় পর্যন্ত তারা বাঙলার এক শক্তিশালী জাতি ছিল।

॥ দুই ॥

মনে হয় কৌম সমাজ ও বৃত্তিধারী সমাজের পর বাঙলায় যে-সমাজের উদ্ভব ঘটেছিল, তাতে জাতিভেদ প্রথা ছিল না; ছিল পদাধিকার ঘটিত বৃত্তিভেদ। মনে হয় এটা ঘটেছিল

গুপ্তযুগে বাঙলায় ব্রাহ্মণ্যধর্মের অনুপ্রবেশের পর। এটা আমরা জানতে পারি সমসাময়িক তাম্রপট্টে উল্লেখিত 'প্রধান কায়স্থ', 'জ্যেষ্ঠ কায়স্থ', 'প্রতিবেশী', 'কুটুম্ব' প্রভৃতি নাম থেকে। তারপর পাই বৃত্তিধারী গোষ্ঠীর নাম, যথা 'নগরশ্রেষ্ঠী', 'সার্থবাহ', 'ক্ষেত্রকার', 'ব্যাপারী' ইত্যাদি। পরে পালযুগে যখন রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় বাঙলায় বৌদ্ধধর্মের প্রাধান্য ঘটে, তখন বাঙলার বৃত্তিধারী গোষ্ঠীগুলি আর বৈবাহিক আদানপ্রদানের নিমিত্ত স্বতন্ত্র সংস্থা (marriage groups) থাকেনি। বৃত্তিধারী জাতিনির্বিশেষে, তখন বিবাহ হতে থাকে। তখনই বাঙলার জাতিসমূহ সঙ্করত্ব প্রাপ্ত হয়। পালরাজাদের পরে সেনরাজাদের আমলে ব্রাহ্মণ্যধর্মের যখন পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়, তখন বাঙলার সকল জাতিই সঙ্করত্ব দোষে দুষ্ট। সেজন্য 'বৃহদ্ধর্মপুরাণ'–এ বাঙলার সকল জাতিকেই সঙ্কর জাতি বলে অভিহিত করা হয়।

তাদের তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়, যথা– (১) উত্তম সঙ্কর, (২) মধ্যম সঙ্কর ও (৩) অন্ত্যজ। সেই তিন শ্রেণীর তালিকা নীচে দেওয়া হচ্ছে ঃ–

(১) উত্তম সঙ্কর (শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণরা যাদের পুরোহিতের কাজ করে)– (ক) করণ, (খ) অম্বষ্ঠ, (গ) উগ্র, (ঘ) মাগধ, (ঙ) গন্ধবণিক, (চ) কাংস্যবণিক, (ছ) শঙ্খবণিক, (জ) কুম্ভকার, (ঝ) তন্তুবায়, (ঞ) কর্মকার, (ট) সদ্‌গোপ, (ঠ) দাস, (ড) রাজপুত, (ঢ) নাপিত, (ণ) মোদক, (ত) বারুজীবী, (থ) সুত, (দ) মালাকার, (ধ) তাম্বুলী, ও (ন) তৈলক।

(২) মধ্যম সঙ্কর– (ক) তক্ষক, (খ) রজক, (গ) স্বর্ণকার, (ঘ) সুবর্ণবণিক (ঙ) আভীর, (চ) তৈলক, (ছ) ধীবর, (জ) শৌণ্ডিক, (ঝ) নট, (ঞ) শবক, ও (ট) জালিক।

(৩) অন্ত্যজ– (ক) গৃহি, (খ) কুড়ব, (গ) চণ্ডাল, (ঘ) বাদুর, (ঙ) চর্মকার, (চ) ঘটজীবী, (ছ) দোলবাহী, ও (জ) মল্ল।

এছাড়া, আরও যে-সব জাতির উল্লেখ আছে তাদের অন্তর্ভূক্ত হচ্ছে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ (দেবল, গণক, ইত্যাদি) ও ম্লেচ্ছজাতিসমূহ যথা– পুলিন্দ, কক্কস, যবন, খস, সৌম, কম্বোজ, শবর ও খর।

এরপর মধ্যযুগে আরও একটা শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছিল– নবশাখ বিভাগ। নবশাখ হচ্ছে তারা যাদের হাতে ব্রাহ্মণরা জলগ্রহণ করে। এর অন্তর্ভূক্ত ছিল নয়টি জাতি– তিলি, তাঁতী,

মালাকার, সদ্‌গোপ, নাপিত, বারুই, কামার, কুম্ভকার ও ময়রা ।

'বৃহদ্ধর্মপুরাণ' ও 'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ'–এ অন্যান্য যে-সকল জাতির উল্লেখ আছে, মধ্যযুগের সমাজে তারাও বিদ্যমান ছিল । তারাই ছিল সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় । ষোড়শ শতাব্দীতে ময়ূরভট্ট তাঁর 'ধর্মপুরাণ'-এ বাঙলা দেশের জাতিসমূহের এক তালিকা দিয়েছেন । তালিকাটি এখানে উদ্ধৃত করছি; 'সদ্‌গোপ, কৈবর্ত আর গোয়ালা তাম্বুলি । উগ্রক্ষেত্রী, কুম্ভকার, একাদশ তিলি ॥ যোগী ও আশ্বিন তাঁতী মালী মালাকার । নাপিত রজক দুলে আর শঙ্খধর ॥ হাড়ি মুচি ডোম কলু চণ্ডাল প্রভৃতি । মাজি ও বাগদী মেটে নাহি ভেদ জাতি ॥ স্বর্নকার সুবর্ণবণিক, কর্মকার । সুত্রধর গন্ধবেনে ধীবর ও পোদ্দার । ক্ষত্রিয় বারুই বৈদ্য পোদ পাকমারা । পরিল তামার বালা কায়স্থ কেওরা ॥।' ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত দ্বিজ হরিরামের 'চণ্ডীকাব্য' ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যেও আমরা এই সকল জাতির উল্লেখ পাই । বর্তমানেও এ-সকল জাতি বাঙলা দেশে বর্তমান ।

॥ তিন ॥

ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী বাঙলা দেশের জাতিসমূহ এখন দুই শ্রেণীতে বিভক্ত– (১) বর্ণহিন্দু, ও (২) তফশীলভূক্ত জাতি । তফশীলভূক্ত জাতিসমূহ হচ্ছে– (১) বাউরী, (২) চামার, (৩) ধোবা বা রজক, (৪) ডোম, (৫) দোসাধ, (৬) ঘাসি, (৭) লালবেগী, (৮) মুসাহার, (৯) পান, (১০) পাশি, (১১) রাজওয়ার, (১২) তুরি, (১৩) বাগদি, দুলে, (১৪) বাহেলিয়া, (১৫) বাইতি, (১৬) বেদিয়া, (১৭) বেলদার, (১৮) ভুঁইমালী, (১৯) ভুইয়া, (২০) বিন্দ, (২১) দামাই, (২২) দোয়াই, (২৩) গোঁড়ি, (২৪) হাড়ি, (২৫) জেলে কৈবর্ত, (২৬) ঝালোমালো, (২৭) কাদার, (২৮) কামি, (২৯) কান্দ্রা, (৩০) কেওরা, (৩১) করেঙ্গা, (৩২) কাউর, (৩৩) কেওট, (৩৪) খটিক, (৩৫) কোচ, (৩৬) কোনাই, (৩৭) কোঁয়ার, (৩৮) কোটাল, (৩৯) লোথার, (৪০) মাহার, (৪১) মাল, মল্ল, (৪২) মাল্লা, (৪৩) মেথর, (৪৪) নমঃশূদ্র, (৪৫) নুনিয়া, (৪৬) পলিয়া, (৪৭) পাটনি, (৪৮) পোদ

বা পৌণ্ড্র, (৪৯) রাজবংশী, (৫০) সরকি, (৫১) শুঁড়ি, (৫২) তিয়র, (৫৩) কানটার, (৫৪) টোপল, (৫৫) ভোগতা, (৫৬) দাবগর, (৫৭) হালালখোর, (৫৮) কানজর, (৫৯) কুরারিয়ার, (৬০) নট, (৬১) ভূমিজ, (৬২) ভঙ্গী, (৬৩) খয়রা। এছাড়া, বাকী সবজাত বর্ণ হিন্দু। অনেকের ধারণা আছে যে তপশীলভূক্ত জাতিরা সকলে নীচু জাত। কিন্তু তা নয়, কেননা, তপশীলভূক্ত জাতির তালিকায় আমরা এমন নামও পাই, যারা মনুর 'মানবধর্মশাস্ত্র'-এ মর্যাদাপূর্ণ স্থান পেয়েছে।

বাঙলার তপশীলভূক্ত জাতি সমূহের মোট জনসংখ্যা সমষ্টিগতভাবে ৮৭.৬৭ শতাংশ। বাঙলায় তপশীলভূক্ত জাতি সমূহের সবচেয়ে বেশি জনসংখ্যা দেখতে পাওয়া যায় চব্বিশ পরগণায়। এরপর ক্রমহ্রাসমান অবস্থায় স্থান পায় বর্ধমান, মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া। পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসংখ্যার তুলনায় সবচেয়ে বেশি তপশীলভূক্ত লোকসংখ্যা দেখতে পাওয়া যায় কুচবিহারে (৪৬.৯০ শতাংশ)। এরপর স্থান পায় জলপাইগুড়ি (৩০.৮০ শতাংশ), বাঁকুড়া (২৯.৬০ শতাংশ) বীরভূম (২৯.১৪ শতাংশ), বর্ধমান (২৪.৫ শতাংশ) ও চব্বিশ পরগণা (২৪.২৮ শতাংশ)।

৬৩টি হিন্দুসমাজভূক্ত তপশীলভূক্ত জাতি ছাড়া, পশ্চিমবঙ্গে ৪১টি উপজাতি আছে। তাদের মধ্যে প্রধান হচ্ছে সাঁওতাল, ওঁরাও, মুণ্ডা, ভূমিজ, কোরা, লোধা বা খেরিয়া, হো, ভুটিয়া, লেপচা, মহালি, মেচ, নাগেসিয়া ও রভা।

॥ চার ॥

ভারতীয় সংবিধানের ৩৪০ ধারায় তপশীলভূক্ত জাতি ও উপজাতিদের শিক্ষা ও চাকুরীক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধাদানের ব্যবস্থা আছে। সম্প্রতি মণ্ডল কমিশন এই তালিকা প্রসারিত করে এদের নাম দিয়েছেন 'অনুন্নত শ্রেণী' (backward classes) এবং তাদের উন্নয়নের জন্য বিস্তারিত সুপারিশ করেছেন। মণ্ডল কমিশনের নির্ধারিত 'অন্যান্য অনুন্নত শ্রেণী' ('other backward classes or O.B.C.) হচ্ছে– (১) আচার্য, আচার্যি, (২) অধিকারী, (৩) আগারিয়া, আংগারিয়া, (৪) অঘোর, (৫) অগ্রদান, অগ্রদানী, (৬) আহির, গোয়ালা, গোপ,

সদ্‌গোপ, যাদব, গোলা, গাওয়ার, (৭) আমানত, আমাত, আমাথ, (৮) আনসারি (মুসলিম), (৯) বাদী (নেপালী), (১০) বাগ, (১১) বাগল, (১২) বৈশ্য কাপালী, (১৩) বাজাদার, বাজানীয়া, বেদে, (১৪) বনজরা, (১৫) বনযোগী, (১৬) বনুয়া, বুনা, বুন্না, বুনো, (১৭) বড়গিরি, (১৮) বড়চাঁই, চাই, চাঁই, (১৯) বাড়ই, বাঢ়ই, বিশ্বকর্মা, ঘাটি, সূত্রধর, (২০) বর্ণ ব্রাহ্মণ, পতিত ব্রাহ্মণ, (২২) বারুই, বারুজীবী, (২৩) বাথুড়ি, (২৪) বেতকার, (২৫) বেড়ুয়া, (২৬) ভাঙ্গী, (২৭) ভাঁট, (২৮) ভড়, (২৯) ভড়ভুজা, ভুজাওয়ালা, (৩০) ভাট, (৩১) ভাটিয়াড়া, রজ্জকী, (৩২) ভাটিয়া, (৩৩) ভোটিয়া, (৩৪) ভুগল, (৩৫) বিন, (৩৬) বিনঝিয়া, (৩৭) বিনাঝাওয়ার, (৩৮) বিনজিনা, (৩৯) বীর্ষিয়া, (৪০) চাক, (৪১) চামলিং, (৪২) চাষা-ধোবা, হলধর, হালারি, সচ্চাষী, (৪৩) চাষী কৈবর্ত, (৪৪) চিক, চিকওয়া, কশাই, কাশ্বব, (৪৫) চিড়িয়ামার, (৪৬) চিত্রকর, (৪৭) চুড়িহার, লাখেরা, লাহেরা, (৪৮) দাফলী, (৪৯) দলু, (৫০) দর্জি, ইদ্রিস, (৫১) দাশ, (৫২) চেকারু, (৫৩) ধেনুয়ার, (৫৪) ধুনিয়া, মনচুরি, (৫৫) দিলপালী, (৫৬) দুরাজ, (৫৭) ফকির, সাঁই, (৫৮) গড়বা, (৫৯) গদ্দী, ঘোষী, (৬০) গাইন, (৬১) গণ্ড, (৬২) গড়াই, (৬৩) ঘাটোয়াল, (৬৪) ঘাটোয়ার, (৬৫) ঘুসুড়িয়া, (৬৬) গোদড়া, (৬৭) গোখা, (৬৮) গোণ্ডা, (৬৯) গোড়ে, (৬৯-এ) গোর্খা, (৭০) গোয়ার, (৭১) গুধড়ি, (৭২) হাড়ি, (৭৩) হালালখোর, (৭৪) হালোই, (৭৫) হাওয়ারী, (৭৬) হেলা, (৭৭) ইব্রাহিমী, (৭৮) ইরিকা, (৭৯) জিয়োনী, (৮০) জুয়াঙ, (৮১) কাছাড়ী, (৮২) কাগজী, (৮৩) কাহার (৮৪) কয়রা, (৮৫) কলু, তেলী, গরাই, মণ্ডল, সাধুখাঁ, পাল, পাত্র, সাধু, বারিক, (৮৬) কালোয়ার, (৮৭) কামার, (৮৮) কাঁ, কাঁউ, (৮৯) কন্দ, (৯০) কন্দু, (৯১) কাঁসারী, কাংস্যকার, (৯২) কাপালী, (৯৩) কাপুড়িয়া, (৯৪) করণী, (৯৫) কর, (৯৬) কর্মকার, (৯৭) কারোয়াল নট, করোয়াল নট্‌স্‌, (৯৮) কসাই, মাজি, (৯৯) কাস্ত, (১০০) কাস্থ, (১০১) কেলা, (১০২) খামি, (১০৩) খন্দইত, (১০৪) খড়গ, (১০৫) খাড়িয়া, (১০৬) খেন, (১০৭) খেড়োয়ার, (১০৮) খেতাউড়ি, (১০৯) খেয়াং, (১১০) খয়রা, (১১১) কীচক, (১১২) কিশরওয়াকী, (১১৩) কোড়া, (১১৪) কোয়েরী, (১১৫) কোল, (১১৬) কোলী, (১১৭) কোলু, (১১৮) কুকী, (১১৯) কুম্ভার, কুমার, কুম্ভকার, কুমহার রুদ্র,

(১২০) কুঞ্জর, রাইন, (১২১) কুর্মী, (১২২) লকড়, (১২৩) লাকড়া, (১২৪) লুসেই, (১২৫) মাছুয়া, (১২৬) মখিয়া জেম, (১২৭) মহাদরদ, (১২৮) মহতা, (১২৯) মাহাতো, (১৩০) মাহুরিয়া, (১৩১) মাহিষ্য, (১৩২) মাঝি, (১৩৩) মালাকার, (১৩৪) মালী, (১৩৫) মাংগান, (১৩৬) মাংগার, (১৩৭) মাটিয়ার, (১৩৮) মীরশিকার, (১৩৯) মোগার, মোরগাউ, (১৪০) মোমিন, (১৪১) মড়াপোড়া ব্রাহ্মণ, (১৪২) মগ, (১৪৩) নাপিত, (১৪৪) নায়ী, হাজ্জাম, নাইয়া, নাপিত, (১৪৫) নন্দবল, (১৪৬) নাথ, যুগী, (১৪৭) নববৌদ্ধ, (১৪৮) নেওয়ার, (১৪৯) পুণ্ডরী, (১৫০) পন্থি, (১৫১) পটুয়া, (১৫২) পীরালী, (১৫৩) রাজু, (১৫৪) রাখাল, (১৫৫) রানা, (১৫৬) রংরেজ, (১৫৭) রসালী, (১৫৮) রোসঙ্গিয়া, (১৫৯) সাহা, (১৬০) শঙ্খকার, শর্খেরু, (১৬১) সয়ার, (১৬২) তপশীলী, ধর্মান্তরিত ক্রীশ্চান, (১৬৩) সার্গিভ পেষা, (১৬৪) শিয়াল, (১৬৫) সোনার, সোনার কর্মকার, (১৬৬) শুকলী, (১৬৭) তামাং, (১৬৮) তাম্বলী, তামালী, তামুলী, (১৬৯) তাঁতী, তন্তুবায়, (১৭০) থাপা, (১৭১) থাড়ু, (১৭২) তিলি, (১৭৩) তিপারা, (১৭৪) তিপ্পেরা, (১৭৫) তুরহা, (১৭৬) উরাও, বন্দোত, হারো করকটা, লুইডু, সিথেও, তিগগা, তিরকী, (১৭৭) ব্যাসোক্ত।

মণ্ডল কমিশনের রিপোর্টে এই সকল জাতির মধ্য থেকে কিছু জাতিকে আবার 'দলিত অনুন্নত শ্রেণী' (Depressed Backward Classes) হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাদের মধ্যে আছে উক্ত তালিকার (২), (৩), (৪), (৭), (১০), (১১), (১৩), (১৪), (১৬), (১৭), (১৮), (২১), (২৩), (২৫), (২৬), (২৭), (২৮), (৩০), (৩১), (৩৩), (৩৪), (৩৫), (৩৬), (৩৭), (৩৯), (৪০), (৪১), (৪২), (৪৪), (৪৫), (৪৬), (৪৭), (৪৯), (৫২), (৫৩), (৫৫), (৫৬), (৫৮), (৬০), (৬১), (৬২), (৬৬), (৬৮), (৬৯), (৭১), (৭২), (৭৩), (৭৫), (৭৬), (৭৮), (৮০), (৮৩), (৮৪), (৮৬), (৯৩), (৯৪), (৯৫), (৯৭), (১০০), (১০১), (১০৪), (১০৬), (১০৭), (১০৯), (১১০), (১১১), (১১৩), (১১৬), (১১৮), (১২০), (১২২), (১২৪), (১২৫), (১২৬), (১২৭), (১৩৫), (১৩৬), (১৩৭), (১৪২), (১৫১), (১৫২), (১৫৪), (১৫৭), (১৫৮), (১৬১), (১৬৩), (১৬৪), (১৬৭), (১৭১), (১৭৩), (১৭৪), (১৭৫), (১৭৬), নম্বর জাতিগুলি। (Report of the Mandal Commission, Vol. II pages 213-14).

# পাল-পরব ও উৎসব

বাঙালীর তেত্রিশ কোটি দেবতা এই গুলির মধ্যে কিছু শাস্ত্রীয়, আর বাকী লোকায়ত। এ সকল দেবদেবীকে উপলক্ষ করে বাঙালী যে-সব পূজা ও উৎসব অনুষ্ঠিত করত, তা বাঙালী জীবনকে সারা বৎসর আনন্দ মুখরিত করে রাখত। শাস্ত্রীয় প্রধান পূজা ও উৎসবের মধ্যে ছিল (বা এখনও আছে) বৈশাখ মাসে গন্ধেশ্বরী পূজা, আষাঢ় মাসে স্নানযাত্রা ও রথযাত্রা, ভাদ্রমাসে ঝুলনযাত্রা ও জন্মাষ্টমী, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা, জগদ্ধাত্রীপূজা ও কার্ত্তিক পূজা, অগ্রহায়ণ মাসে রাসযাত্রা, মাঘ মাসে সরস্বতী পূজা, ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা, ও শিবরাত্রি, ঘন্টাকর্ণপূজা ইত্যাদি।

॥ দুই ॥

লোকায়ত দেবদেবীদের নিয়ে যে-সব পূজা ও উৎসবাদি হয়, তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে, গাজন, টুসু, ভাদু ইত্যাদি। চৈত্র সংক্রান্তিতে অনুষ্ঠেয় শিবের গাজন বাঙলার সর্বত্রই পালিত হয়। অঞ্চলভেদে তাদের মধ্যে কিছু আঞ্চলিক রূপের পার্থক্য থাকলেও মোট কাঠামোটা একই রকমের। ভক্ত সন্ন্যাসীরা ও বৈতনিক এবং অবৈতনিক কর্মচারীরা এর অনুষ্ঠান সমূহে অংশ গ্রহণ করে। হর-পার্বতীর আরাধনা, মুখোসখেলা, মড়াখেলা, বাণফোঁড়া, নানারূপ কৃচ্ছ্রসাধন করা ও ঢাকঢোল বাজিয়ে শিবের নাম উচ্চারণ করে গাজনতলা মুখরিত করে রাখাই এর বৈশিষ্ট্য। মালদহে শিবের গাজনকে 'আদ্যের গম্ভীরা' বলা হয়। চৈত্রমাসের শেষে তিন-চারদিন গম্ভীরা উৎসব স্থায়ী হয়। গম্ভীরার জন্য একটা মণ্ডপ তৈরি করা হয় ও সদ্য ফোটা

পদ্মফুল দিয়ে মণ্ডপ সাজানো হয়। নানা অনুষ্ঠানের ভেতর দিয়ে ঢাকঢোল বাজিয়ে ভক্তগণ শোভাযাত্রা বের করে। মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি মহকুমার জেমো ও উদ্ধারণপুরের গাজনে সন্ন্যাসীদের একটা শ্রেণীভেদ ও কর্মভেদ আছে। সব গাজনেই সন্ন্যাসীরা নানারূপ কৃচ্ছ্রসাধন করে। জেমো-কান্দিতে তারা কাঁটাগাছের ডালে শয্যা রচনা করে তার ওপর গড়াগড়ি দেয়। বাঁকুড়ার বহুলারা গ্রামে তারা লোহার কাঁটা-বেধানো পাটাতনের ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে বুকের ওপর ব্রাহ্মণ-পূজারীকে বসিয়ে, ঘাট থেকে গাজনতলায় আসে। এছাড়া, জিভ-বাণ, কপাল-বাণ ইত্যাদিও একসময় হত। কলকাতার গাজনেও উনবিংশ শতাব্দীতে গাজনের সন্ন্যাসীরা বুকে বাণ ফুটিয়ে কালীঘাট থেকে নিজ নিজ মহল্লায় আসত। উনবিংশ শতাব্দীর সংবাদপত্র সমূহ থেকে জানতে পারা যায় তখন কলকাতায় ও বাঙলার গ্রামে গ্রামে গাজন উৎসব হত। গাজনের একটা প্রধান অঙ্গ হচ্ছে মেলা। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'শিশু'-তে লিখেছেন— 'মেলা বসবে গাজনতলায়'।

গাজন যে মাত্র শিবের হয়, তা নয়; ধর্মঠাকুরেরও হয়। পশ্চিমবঙ্গের রাঢ় অঞ্চলে খুব ব্যাপকভাবে ধর্মঠাকুরের পূজা প্রচলিত আছে। এই লৌকিক দেবতার মৌলিক পরিচয় অজ্ঞাত। আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন, ধর্মঠাকুর আদিম সমাজের সূর্য দেবতা। অনেকে আবার বলেন তিনি বুদ্ধ বা শিব। তিনি নিরাকার। সেজন্য শিলারূপেই তিনি পূজিত হন। তবে তিনি যে আদিম সমাজের দেবতা, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, কেননা ডোমজাতীয় লোকেরাই ধর্মঠাকুরের পুরোহিত। তাছাড়া, ধর্মঠাকুরের উৎসবে কুক্কুট, শূকর ইত্যাদি বলি দেওয়া হয়।

তবে ধর্মঠাকুরের গাজনের সঙ্গে শিবের গাজনের অনেক মিল আছে। সে জন্য অনেকে মনে করেন যে, ধর্মঠাকুরের গাজনের দেখাদেখিই শিবের গাজনের উদ্ভব ঘটেছে। এর সপক্ষে যেটা প্রমাণ হিসাবে খাড়া করা হয়, সেটা হচ্ছে বর্ধমান জেলার কুড়মুনের গাজন। কুড়মুনে একসময় বৈশাখী পূর্ণিমায় ধর্মঠাকুরের গাজনই মহাসমারোহের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হত। পরে গ্রামের মণ্ডলরা একে শিবের গাজনে রূপান্তরিত করে। এছাড়া, বর্ধমান জেলার জামালপুরের বুড়ো রাজার গাজনে যে নৈবেদ্য দেওয়া হয়, তার মাঝখানে একটা দাগ

কেটে দেওয়া হয়। তার অর্থ অর্দ্ধেক নৈবেদ্য শিবের, আর অর্দ্ধেক ধর্মঠাকুরের। আরও, মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি মহকুমায় ধর্মঠাকুরের গাজনে যে সকল গান গাওয়া হয়, তার একটা গান হচ্ছে– 'শ্মশানে গিয়েছিলাম, মশানে গিয়েছিলাম, সঙ্গে গিয়েছিল কে ? কার্তিক, গণেশ দুটি ভাই সঙ্গে গিয়েছে।' এ থেকেও ধর্মঠাকুরের গাজনের সঙ্গে শিবের গাজনের সম্পর্ক সূচিত হয়। বস্তুতঃ এগুলো হচ্ছে এই দুই দেবতার মধ্যে সমন্বয়ের চেষ্টা। অতীত ইতিহাসের শেষ স্মৃতি চিহ্ন মাত্র। সবশেষে বলি অনেক জায়গায় ধর্মঠাকুরকে ধর্মরাজ বলা হয়।

॥ তিন ॥

টুসুর পূজা পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া, মানভূম, বাঁকুড়া প্রভৃতি সীমান্তবর্তী অঞ্চলে প্রচলিত। বস্তুত পুরুলিয়া-মানভূম-বাঁকুড়া অঞ্চলের লোকদের কাছে টুসুর চেয়ে বড় উৎসব সারা বছরে আর কিছু নেই। কুমারী মেয়েরাই টুসু উৎসবের প্রধান ব্রতী ও উদ্যোগী। টুসুর উৎসব অগ্রহায়ণ মাসের সংক্রান্তিতে শুরু হয় ও পৌষ মাসের সংক্রান্তিতে শেষ হয়। টুসুপূজার জন্য কোন ব্রাহ্মণ-পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না। মেয়েরাই মহা আনন্দের সঙ্গে এ-পূজা সম্পূর্ণ করে। প্রত্যেক বাড়িতেই সন্ধ্যেবেলা টুসুগানের আসর বসে। গানের মাধ্যমে মেয়েরা নিজেদের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্খা ও প্রেম-প্রীতি-ভালবাসার কথা প্রকাশ করে।

টুসুর প্রতীক হচ্ছে 'চৌডল' বা চতুর্দোলা। এগুলো রঙীন কাগজ দিয়ে খুব হালকা ধরনে তৈরি করা হয়–, যাতে যে-কোন মেয়ে এটা সহজে বহন করে নিয়ে যেতে পারে। টুসু উৎসবের চরম পরিণতি হয় পৌষ সংক্রান্তির দিনে। সেটাই হচ্ছে নিকটস্থ জলাশয় বা নদীতে টুসু ভাসান দেবার দিন। ভাসান উপলক্ষে মিছিল বেরোয়, এবং সকলে টুসুর গানে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে। মানভূমের মধ্যবিত্ত ঘরের লোকেরা টুসুর উৎসবের দিন খিচুড়ি ও খাসির মাংস খায়। সেদিন সব বাড়িতে তৈরি হয় নূতন চালের তৈরি পিঠে ও নারকেলের পুর দেওয়া নানারকম মিষ্টান্ন, যে-রকম

বাঙলাদেশের অন্যত্র পৌষপার্বণে বা পৌষালিতে তৈরি হয়। অনেকে মনে করেন ধানের তুষ থেকে টুসু শব্দের উদ্ভব।

॥ চার॥

পুরুলিয়া, পশ্চিম বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান ও বীরভূম জেলায় সমগ্র ভাদ্রমাসে ভাদু উৎসব হয়। লোককাহিনী অনুযায়ী পঞ্চকোটের এক রাজকন্যা ভদ্রেশ্বরী (ডাক নাম ভাদু) এই উৎসব প্রবর্তিত করেছিল। এটাও কুমারী মেয়েদের উৎসব এবং বাগদী, বাউরি, ডোম ও আদিবাসী সমাজে এর প্রচলন বেশি পরিমাণে লক্ষ্য করা যায়। সারা ভাদ্রমাস লোকসঙ্গীত ও লোকনৃত্যের মাধ্যমে এ উৎসব পালিত হয়। এই উৎসব উপলক্ষে মাটির ভাদুমূর্তি তৈরি করা হয়। মূর্তি হেমবর্ণা ক্ষুদ্রাকৃতি ও পদ্মের ওপর উপবিষ্টা বা দণ্ডায়মানা। ভাদুর পূজার জন্যও ব্রাহ্মণ-পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না। ভাসান-এর আগের রাত্রিকে 'জাগরণ' বলা হয়। সেদিন উদ্দাম নাচগান চলে এবং মেয়েপুরুষ সকলে অবাধে মেলামেশা করে।

বলা বাহুল্য, এ-সব কালোপযোগী উৎসব আদিবাসী সমাজ থেকে এসেছে এবং লোকসমাজে হিন্দুর জীবনচর্যার সঙ্গে মিশে গিয়েছে। উল্লেখনীয় যে অগ্রহায়ণ মাসে প্রতি রবিবার মেয়েরা যে ইতুপূজা করে, তা-ও পুরোহিত ব্যতিরেকে মেয়েরা নিজেরাই করে। এটাও যে আদিম সমাজ থেকে গৃহীত হয়েছে, তা ইতুর ঘটের উপকরণ ও ইতুপূজা সম্পর্কে যে উপাখ্যান আছে, তাতে উমনো-ঝুমনো, এই নাম দুটি থেকেই প্রকাশ পায়। ইতু ঘটে পূজিত হন। অগ্রহায়ণ মাসের সংক্রান্তিতে ইতুর-ঘট নিকটস্থ জলাশয় বা নদীতে ভাসান দেওয়া হয়।

॥ পাঁচ॥

বাঙালীর আরও চারটি জনপ্রিয় লৌকিক দেবতা হচ্ছে, রক্ষাকালী, ওলাইচণ্ডী, মনসা ও শীতলা। পল্লীর জনগণের

মঙ্গলের জন্য, বিশেষ করে মহামারীর সময় রক্ষাকালীর পূজা হয়। গভীর রাত্রে পূজা সমাপ্ত করে, প্রভাতে সূর্যোদয়ের পূর্বে প্রতিমার বিসর্জন দেওয়া হয়। ওলাইচণ্ডী ওলাউঠার দেবী। নানা জায়গায় এক সিঁদুর লেপা পাথরের গোলা রূপী ওলাইচণ্ডীর মন্দির আছে। মেয়েরা বছরে একদিন ওলাইচণ্ডীতলায় গিয়ে পূজান্তে সেখানে রান্না করে খায়। শীতলা বসন্তের দেবতা। বসন্তকালে বসন্তের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য লোক নিজপল্লীতে প্রতিমা এনে সমারোহের সঙ্গে শীতলার পূজা করে। পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলায় দীঘার সন্নিকটে রামনগর গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে মহাসমারোহের সঙ্গে শীতলার পূজা হয়। লোকে বলে তারা নাকি দেখেছে যে গভীর রাত্রে সপ্তযোগিনী ও ৬৪ ডাকিনী এসে মাকে সাহচর্য দেয়।

শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমীতে মনসাদেবীর পূজা হয়। উঠানে মনসাগাছ পুঁতে তার পূজা করা হয়। শ্রাবণ মাসের সংক্রান্তিতেও সমারোহ সহকারে মনসার পূজা হয়। সন্ধ্যেবেলা সুর করে মনসামঙ্গল পাঠ করা হয়। ভাদ্রমাসের সংক্রান্তিতে উনানের মধ্যে মনসাগাছের ডাল পুঁতে মনসার পূজা কিছুদিন আগে পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের ঘরে ঘরে প্রচলিত ছিল। মনসাপূজা খুব সম্ভবত বীরভূমে উদ্ভূত হয়েছিল।

# বিশ্বাস, যাদু ও তুকগুণ

আশি-নব্বই বছর আগে পর্যন্ত বাঙলা দেশে এককড়ি, দুকড়ি, তিনকড়ি, পাঁচকড়ি, সাতকড়ি ইত্যাদি নামগুলো খুব প্রচলিত ছিল। আজ আর নাই। কেননা যে বিশ্বাসের ভিত্তিতে বাঙালী মায়েরা এই নামগুলো রাখত, সে বিশ্বাস আজ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। বাঙালী মায়েরা তখন বিশ্বাস করত যে মৃতবৎসা নারী যদি সন্তান প্রসবান্তে কোন সন্তানবতী মায়ের কাছে সে সন্তানকে সমর্পণ করে, ও পরে 'কড়ি দিয়ে কিনলাম' বলে এক, দুই, তিন, পাঁচ, সাতটা কড়ি দিয়ে ফেরত নেয় তাহলে সে সন্তান আর মারা যাবে না। যত সংখ্যক কড়ি দিয়ে কিনত, সেই অনুযায়ী সে ছেলের নাম রাখা হত। এটা ছেলের আয়ু অর্জন করবার একটা যাদু বিশেষ ছিল। নাম রাখা সম্বন্ধে বাঙালী সমাজে মাত্র এই একটি যাদুই প্রচলিত ছিল না। আরও যাদুভিত্তিক বিশ্বাস ও প্রথা বাঙালী সমাজে প্রচলিত ছিল। যেমন বাঙালী বিশ্বাস করত যে যদি দুই ছেলে বা দুই মেয়ের পর যথাক্রমে মেয়ে বা ছেলে হয়, তা হলে সেই ছেলে বা মেয়ের মঙ্গলার্থে কোন উচ্চস্থান থেকে একটি তৈজসপত্র নীচে ছুঁড়ে ফেলে ভেঙে ফেললে এবং সেই ছেলে বা মেয়ের নামের আদ্যাক্ষর 'শ', 'স' বা 'ষ' দিয়ে রাখলে, সেই ছেলে বা মেয়ের জন্মগত দোষ কেটে যাবে। এই ভাবেই সরোজ, সরোজিনী, সুষমা, শৈব্যা, শৈবলিনী, শ্যামা, শ্যামচাঁদ, ষষ্ঠীচরণ, ষষ্ঠীব্রত ইত্যাদি নামগুলোর উদ্ভব ঘটেছিল। বাঙালী আরও বিশ্বাস করত যে ছেলেপুলেদের ঠাকুর দেবতাদের নাম রাখলে তাদের মঙ্গল হবে, এবং তাদের ওপর ভুতপ্রেতের নজর পড়বে না। সেজন্য তারা ছেলেমেয়েদের নাম রাখত রামকৃষ্ণ, রাধাচরণ, জগন্নাথ, বলরাম, কার্তিক, গনেশ, লক্ষ্মী, জনার্দন, সরস্বতী, কালী, সতী ইত্যাদি। এসব

নাম আজ অপ্রচলিত হয়ে গিয়েছে। আরও অপ্রচলিত হয়ে গিয়েছে মেয়েদের থাকমনি, এলোকেশী, মহামায়া, অন্নপূর্ণা, ব্রহ্মময়ী ইত্যাদি নাম। এছাড়া ছিল 'দোর ধরা' নাম। সন্তানহীনা নারী কোন ঠাকুরদেবতার কাছে মানত করে যে সন্তান পেতেন, তার নাম রাখতেন সেই দেবতার নামে। যেমন পাঁচুঠাকুরের কাছে মানত করে যে সন্তান পেতেন তার নাম রাখতেন পঞ্চানন। তারকেশ্বরে ধরণা দিয়ে যে সন্তান লাভ করতেন তার নাম রাখতেন তারকনাথ ইত্যাদি।

ছেলেপুলেদের নামকরণ সম্বন্ধে মাত্র উপরোক্ত বিশ্বাস ও প্রথাই যে কার্যকর ছিল তা নয়। জ্যোতিষের প্রভাবও ছিল। যে ক্ষেত্রে সন্তানের কোষ্ঠী-ঠিকুজী তৈরি করা হত, সে-সব ক্ষেত্রেই মাত্র এটা অনুসরণ করা হত। হিন্দু জ্যোতিষ অনুযায়ী রাশিচক্রের যে-ঘরে চন্দ্র থাকে, সেটাই জাতকের রাশি। রাশি অনুযায়ী জাতকের নামের আদ্যাক্ষর নির্ণীত হত। যথা মেষরাশির অ, ল; বৃষরাশির উ, ব; মিথুন রাশির ক, ছ; কর্কট রাশির ভ, হ; সিংহ রাশির ম, ট; কন্যারাশির গ,ঠ; তুলারাশির র, ত; বৃশ্চিক রাশির ন, য; ধনুরাশির ধ, ভ; মকর রাশির খ, জ; কুম্ভ রাশির গ, শ; মীন রাশির দ, চ ও, ঝ। তবে অনেকসময় রাশি অনুযায়ী নাম কোষ্ঠী-ঠিকুজিতেই লিপিবদ্ধ অবস্থায় থেকে যেত। ওটা প্রকাশ করা হত না। কেননা আগেকার দিনের লোকের বিশ্বাস ছিল্ল যে রাশি-নাম প্রকাশ করলে শত্রু পক্ষ গুণতুক করে তার ক্ষতি করবে। সেজন্য রাশি নামের পরিবর্তে ছেলেপুলের অপর কোন নাম রাখা হত।

আগেকার দিনের এ-সব প্রথা ও বিশ্বাস আজ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কেউ-ই ছেলের নাম গদাধর, হলধর, পীতাম্বর বা যুধিষ্ঠির রাখে না। তৎপরিবর্তে রাখে অভীক, অরূপ, অনীক, অরুণ, সুভাষ, চিত্তরঞ্জন, সৌমিত্র, উত্তমকুমার, রবীন্দ্র ইত্যাদি। অনুরূপভাবে মেয়েদের নাম রাখা হয় সুচিত্রা, সুপ্রিয়া, প্রিয়া, লীনা, রীনা, কেতকী, শেফালি, কাবেরী ইত্যাদি। দিনে দিনে বাঙালী আজ ছেলেপুলেদের নূতন নূতন নাম আবিষ্কার করছে।

॥ দুই ॥

ব্যবহারিক জীবনেও বাঙালীর বিশ্বাস ও প্রথার কুল-

কিনারা ছিল না। বাম অঙ্গ বিশেষ করে পা বা চোখ নাচলে সেটা অমঙ্গল মনে করত। খেতে খেতে 'বিষম' লাগলে বলত, অপর কেউ নাম করছে। কারুর নাম করার সময় তার আগমন ঘটলে বলা হত সে অনেকদিন বাঁচবে। পাড়ায় বিড়াল কাঁদলে সেটা অমঙ্গল বলে মনে করত। শনি বা মঙ্গলবারে পাড়ায় কেউ মারা গেলে সেটা অলক্ষণ বলে মনে করত এবং বলত, পাড়ায় আরও তিনজন মারা যাবে। জ্যৈষ্ঠ মাসে জ্যেষ্ঠ ছেলের বিয়ে দিত না, বলত এটা অশুভ। শুভকর্মে বিধবার উপস্থিতিও অশুভ বলে মনে করত। একাদশীর দিন সধবা স্ত্রীলোক মাছ না খেলে বলত তার কপালে বৈধব্য যোগ আছে। সধবা স্ত্রীলোক স্বামীর আগে কখনও অন্নগ্রহণ করত না। সেকালের লোক ভুতপ্রেতে খুব বিশ্বাস করত। তবে ভাবত রাম নাম করলে বা কাছে লোহা থাকলে ভুতপ্রেত তার কিছু অনিষ্ট করতে পারবে না। কেউ এক চোখ দেখালে ঝগড়া হবে, এবং সেজন্য তাকে দুচোখ বন্ধ করে দেখাতে বলত। মেয়েরা রাত্রে চুল বাঁধত না বা সিঁথিতে সিঁদুর পরত না। বলত এরূপ করলে সে মেয়েছেলে কুলটা হবে। রাত্রে হাত থেকে তৈজসপত্র পড়ে গেলে ভাবত রাত্রে বাড়িতে চোর আসবে। বাড়ি থেকে বেরুবার সময় কোনরূপ 'বাধা' পড়লে, ফিরে এসে একবার বসে নিয়ে পুনরায় যাত্রা করত। বাচ্ছাছেলেরা দুধ তুললে বলত ছেলের ওপর কারুর 'নজর' লেগেছে। বয়স্ক লোকেরাও বিশ্বাস করত যে খাবার সময় কেউ তাদের পাতের দিকে চাইলে, সে তার খাওয়ার ওপর 'নজর' দিচ্ছে, এবং তাতে তার বদহজম হবে। যদি কেউ কারুকে বলত যে তার শরীর আগেকার চেয়ে ভাল দেখাচ্ছে, তাহলে ভাবত সে তার শরীরের ওপর 'নজর' দিচ্ছে, এবং শীঘ্রই তার শরীরের পতন ঘটবে। বিয়ের সময় লোক যে পথে যেত, বাড়ি ফেরবার সময় সে পথে আসত না। অন্য পথ দিয়ে আসত। অপদেবতার 'নজর'—এ বিশ্বাস করত। শনি বা মঙ্গলবারে মেয়েরা ছেলেমেয়েদের কোলে করে নিম, তেঁতুল, বেল ও শ্যাওরা গাছের তলা দিয়ে যেত না। ভাবতো তাতে ছেলেপুলেদের ওপর অপদেবতার 'নজর' লাগবে। রাত্রিকালে ফাঁকা জায়গায় কখনও ছেলেপুলেদের কাঁথা, জামাকাপড় ইত্যাদি শুকোতে দিত না। ভাবত এরূপ করলে অপদেবতার 'নজর' লাগবে। সকালে মাকুন্দ লোকের মুখ দেখলে ভাবত সেদিনটা তার ভাল যাবে না। সকালে কৃপণ লোকের নাম

করলে বলত সমস্ত দিনটাই তার খারাপ যাবে। বলতো সেদিন তার 'হাঁড়ি ফাটবে'। তার মানে সেদিন তার কপালে অন্ন জুটবে না। কোন শুভকাজে বেরুবার সময় তিনজন লোক কখনও একসঙ্গে বেরুত না। হয় দু'জন, আর তা না হলে চার জন যেত। বেরুবার সময় যদি কেউ (নিজ মা ব্যতীত) পিছু ডাকত, তা হলে ভাবত সে যে কাজে যাচ্ছে, সে-কাজ পণ্ড হবে। অনুরূপভাবে যাত্রার সময় কেউ হাঁচলে সেটা অমঙ্গলসূচক ভাবত। দাঁড়কাক ডাকলে সেটা বিপদের সঙ্কেত বলে মনে করত। ভিখারীকে ভিক্ষা দিতে গিয়ে যদি কোন মেয়ের হাত থেকে দু'এক কণা চাল মাটিতে পড়ে যেত, তাহলে বলত সে মেয়ে কন্যা প্রসবিনী হবে (তার মানে সে মেয়ে, মেয়ে 'বিওনি' হবে)। শনি-মঙ্গলবারে কখনও নূতন কাপড় 'ভাঙত' না। ক্ষৌরকর্মে বুধবারটাই শুভ বলে মনে করত। বৃহস্পতিবারে কখনও টাকা-পয়সার লেনদেন করত না। শনিবারে বৃষ্টি আরম্ভ হলে বলত বৃষ্টি সাতদিন হবে। মঙ্গলবারে আরম্ভ হলে বলত বৃষ্টি তিনদিন হবে। হাতের শাঁখা বা পাথরের বাসন-কোসন ভেঙে গেলে সেটা খুব অমঙ্গলসূচক বলে মনে করত। বিয়ের সময় বর-কনের 'গণ'-এর মিল দেখত। এ-রকম অজস্র বিশ্বাস ও প্রথা বাঙালী সমাজে প্রচলিত ছিল। এছাড়া, ডাক ও খনার নানারকম বচনে বিশ্বাস করত। এখনও অনেক বাঙালী সে-সব বচনে বিশ্বাস করে। যেমন 'যদি বর্ষে মাঘের শেষ। ধন্য রাজার পুণ্য দেশ।', 'মঙ্গলের ঊষা বুধে পা। যথা ইচ্ছে তথা যা', 'আগে হতে পিছে ভাল যদি ডাকে মায়ে', 'চৈত্রে কুয়া ভাদ্রে বাণ, নরের মুণ্ড গড়াগড়ি যান', 'শয়নে ভোজনে উপবেশনে বা দানে। এই সপ্তকর্মে হাঁচি আদি সুশোভন।'

॥ তিন ॥

কিছুদিন আগে পর্যন্ত বাঙালী সমাজে নাম উচ্চারণ ও ছোঁয়াছুঁয়ি সম্বন্ধে কতকগুলি বিধিনিষেধ বা taboo ছিল। মেয়েরা স্বামীর, শ্বশুর-ভাশুরের ও অন্যান্য গুরুজনদের নাম উচ্চারণ করত না। তাঁদের নাম উচ্চারণ করতে হলে নামের আদ্যাক্ষর পরিবর্তন করে উচ্চারণ করত। মাত্র তাই নয়।

অন্য কোন জিনিসের মধ্যে যদি সেরূপ কোন নামের উচ্চারণগত শব্দ থাকত, তা হলেও ওইরূপ অক্ষর পরিবর্তন করে নিত। যেমন যদি কারুর শ্বশুরের নাম রামচন্দ্র হত, তাহলে সে রামায়ণ শব্দের পরিবর্তে 'ফামায়ণ' বলত।

ছোঁয়াছুয়ি সম্বন্ধে যে সব বিধিনিষেধ ছিল, তার মধ্যে ভাশুর ও মামাশ্বশুরকে ছোঁয়া নিষিদ্ধ ছিল। যদি দৈবাৎ তাঁদের সঙ্গে ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে যেত, তা হলে 'ধান সোনা উৎসর্গ' করে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হত।

মাত্র সরাসরি ছোঁয়াছুঁয়ি নয়। ছোঁয়াছুঁয়ির সংক্রমণেও বাঙালী বিশ্বাস করত। কিছুকাল আগে পর্যন্ত বাঙলার অন্যতম যানবাহন ছিল পালকি। পালকি বাহকরা সাধারণতঃ দুলে-বাগদি জাতির লোক হত। সেজন্য নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণগণ ও উচ্চবর্ণের নিষ্ঠাবতী মহিলারা যে বস্ত্রে পালকিতে যেতেন, সে-বস্ত্র পরিবর্তন না করে পূজা আহ্নিক বা আহার করতেন না।

রন্ধনশালাতেও বিধবাদের রান্নার জন্য স্বতন্ত্র উনুন ও তৈজসপত্র থাকত, এবং পাছে সেখানে আমিষ রান্নার উপকরণের জন্য ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে যায়, তা নিবারণের জন্য বিশেষ যত্ন নেওয়া হত।

॥ চার ॥

গুণতুকেও বাঙালী বিশ্বাস করত। গ্রামগঞ্জে এখনও করে। যদি দেখে রাস্তার তেমাথায় জবাফুল ও অন্যান্য দ্রব্যের সঙ্গে প্রদীপ রয়েছে, তাহলে বাঙালী তার ত্রিসীমানায় যায় না। বাঙালী বিশ্বাস করে যে এগুলো তারাই রেখে যায় যাদের পরিবারে কেউ দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছে। যারা রেখে যায় তাদের বিশ্বাস যে যারা ওগুলো মারাবে বা স্পর্শ করবে, তারা সেই রোগে আক্রান্ত হবে এবং তাদের রোগী আরোগ্য লাভ করবে। এক পরিবারের বিপর্যয় অপর পরিবারে সংক্রামিত করবার মনোবৃত্তি নিয়েই এগুলো করা হত। নৃতত্ত্বের ভাষায় এ প্রণালীকে সংক্রমণ যাদু বা Contagious magic বলা হয়। 'নিশিডাক'ও এরূপ সংক্রমণের আর এক দৃষ্টান্ত। 'নিশিডাক'টা কি তা এখানে বুঝিয়ে বলা দরকার। যদি কোন পরিবারে কেউ দুরারোগ্য

ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়, তা হলে তারা গুণিনের সাহায্য নেয়। গুণিন এসে একটা ডাবের মুখ কেটে সেটাকে মন্ত্রপূত করে। তারপর সেই পরিবারের লোক সেই ডাবটাকে নিয়ে গভীর রাত্রে কারুর বাড়ি গিয়ে তার নাম ধরে ডাক দেয়। যাকে ডাকা হয়, সে উত্তর দেওয়া মাত্র, যে লোক ডাবটা নিয়ে গেছে সে ডাবের মুখটা বন্ধ করে দেয় এবং সরে পড়ে। যারা এরূপ করে তাদের বিশ্বাস তাদের রোগীর ব্যাধি ওই লোকটাতে সংক্রামিত হ'ল। সেজন্য গ্রামাঞ্চলে কেউ গভীর রাত্রে কারুর নাম ধরে ডাকলে, তিনবার ডাকবার আগে উত্তর দেয় না। কেননা তিনবারের আগে উত্তর না দিলে এই প্রক্রিয়া সফল হয় না। যদি তিনবারের আগে লোকটা উত্তর না দেয়, তাহলে সে সেখান থেকে সরে পড়ে এবং দূরে অপর কোন বাড়িতে গিয়ে চান্স্ নেয়। একশ বছর আগে পর্যন্ত কলকাতার মতো শহরের লোকরাও 'নিশিডাক'—এ বিশ্বাস করত। এখন আর করে না। কিন্তু গ্রামের লোকরা এখনও বিশ্বাস করে, এবং রাত্রিকালে কেউ তিনবার না ডাকলে উত্তর দেয় না। তবে শহরের লোক এখন 'নিশিডাক'—এ বিশ্বাস না করলেও, রাস্তার তেমাথায় রাখা জবাফুল ইত্যাদিকে ভয় করে ও তার ত্রিসীমানায় যায় না। এমন কি সকালে পুরসভার ঝাড়ুদাররা পর্যন্ত সকালে রাস্তা ঝাঁট দিতে এসে যদি তেমাথায় ওরূপ ফুল ইত্যাদি দেখে, তাহলে সে জায়গাটাকে বাদ দিয়ে রাস্তা ঝাঁট দেয়।

॥ পাঁচ ॥

বাঙলা দেশের লোক বিশ্বাস করে যে 'বাদুলে' (বর্ষাকালে যাদের জন্ম) ছেলেমেয়ের বিয়ের সময় বৃষ্টি হবেই। এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে, যাতে না বৃষ্টি হয়, তার জন্য যাদুর আশ্রয় নেয়। এর জন্য দু'রকম প্রক্রিয়া অবলম্বিত হয়। প্রথম প্রক্রিয়া হচ্ছে বাটনা বাটবার শিলখানাকে উলটো করে আকাশের দিকে মুখ করে, কোন খোলা জায়গায় পেতে রাখা। দ্বিতীয় প্রক্রিয়া হচ্ছে প্রতিবেশী কারুর বাড়ি থেকে তাকে না বলে একটা তৈজসপত্র এনে সেটা কোন গোপন স্থানে লুকিয়ে রাখা। বাঙালী মেয়েদের বিশ্বাস এরূপ করলে বৃষ্টি হবে না, এবং তাদের বিবাহের আনন্দ নষ্ট হবে না।

কাকতালীয় হউক, আর নাই হউক, দেখা গিয়েছে সত্যসত্যই বিয়ের সময় বৃষ্টি হয় না।

॥ ছয় ॥

বিপদ ও বিপর্যয় এড়াবার জন্য তাবিজ, মাদুলী ইত্যাদিতে বিশ্বাস বাঙালী এখনও রাখে। স্বামীকে বশীভূত করবার জন্য বা শাশুড়ির গঞ্জনা বা নির্যাতনের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য বাঙালী মেয়েরা প্রায়ই এরূপ মাদুলী বা তাবিজ ধারণ করে। মকদ্দমায় জয়লাভের জন্য বা কর্মক্ষেত্রে উন্নতি ও প্রতিষ্ঠা লাভের জন্যও বাঙালী মাদুলী বা তাবিজ ধারণ করে। যাঁরা এরূপ তাবিজ বা মাদুলী বিক্রয় করে প্যারীচাঁদ মিত্র তাঁর 'আলালের ঘরের দুলাল'–এ তাদের ঠক-চাচা নাম দিয়েছেন।

গ্রহশান্তির জন্যও তাবিজ, মাদুলী ও আংটি ইত্যাদি ধারণ করা হয়। তাবিজ ও মাদুলী ছাড়াও বাঙালী দুষ্টগ্রহ প্রশমনের জন্য নানারূপ ধাতু, রত্ন ও মূলাদি ধারণ করে। যথা সূর্যের জন্য তামা, চন্দ্রের জন্য শঙ্খ, মঙ্গলের জন্য পলা, বুধের জন্য সোনা, বৃহস্পতির জন্য মুক্তা, শুক্রের জন্য হীরা, শনির জন্য নীলা, রাহুর জন্য গোমেদ ও কেতুর জন্য পান্না। বিকল্পে সূর্যের জন্য বিল্বমূল, চন্দ্রের জন্য ক্ষীরিকামূল, মঙ্গলের জন্য অনন্তমূল, বুধের জন্য বিষধরকের মূল, বৃহস্পতির জন্য বামুনহাটির মূল, শুক্রের জন্য রামবাসকের মূল, শনির জন্য শ্বেতবেড়েলার মূল, রাহুর জন্য শ্বেতচন্দনের মূল, ও কেতুর জন্য অশ্বগন্ধার মূল ধারণ করা হয়। আবার অনেক সময় গ্রহ প্রশমনের জন্য মন্ত্র উচ্চারণও করা হয়। রবির মন্ত্র হচ্ছে ওঁং হ্রীং সূর্যায়, চন্দ্রের ওঁ ঐং ক্লীং সোমায়, মঙ্গলের জন্য ওঁ হূং শ্রীং মঙ্গলায়, বুধের জন্য ওঁ ঐং স্ত্রীং শ্রীং বুধায়, বৃহস্পতির জন্য ওঁ হ্রীং ক্লীং হূং বৃহস্পতয়ে, শুক্রের জন্য ওঁ হ্রীং শ্রীং শুক্রায়, শনির জন্য ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং শনৈশ্চরায়, রাহুর জন্য ওঁ ঐং হ্রীং রাহবে, ও কেতুর জন্য ওঁ হ্রীং ঐং কেতবে।

॥ সাত ॥

গ্রামের লোক এখনও ভুতে পাওয়াতে বিশ্বাস করে এবং

ভুত ছাড়াবার জন্য রোজা ডাকে। সাপে কামড়ালেও রোজা ডাকা হয়। রোজার সাপের বিষ বের করে দেবার ক্ষমতা আছে। অনেক সময় রোজারা কুকুরে কামড়ালে কুকুরের বিষও ঝেরে দেয়।

কারুর কিছু চুরি গেলে গ্রামের লোক বাটি চালা, চালপড়া ও নখদর্পনের আশ্রয় নেয়। বাটি চালায় মন্ত্রপূত বাটিটা নিজে নিজে চলতে থাকে ও আসামীর কাছে গিয়ে থেমে যায়। চালপড়ায় মন্ত্রপূত চাল সকলকে চিবোতে দেওয়া হয় এবং যে চুরি করেছে মাত্র তার থুতুর সঙ্গে রক্ত প্রকাশ পায়। নখদর্পনে পারদর্শী ব্যক্তি সমবেত জনতার মধ্যে কোন ব্যক্তির বুড়া আঙ্গুলের নখের ওপর কাজল লাগিয়ে মন্ত্র উচ্চারণ করতে থাকে। ওই কাজলের মধ্যে দোষী ব্যক্তিকে দেখতে পাওয়া যায়।

এই সকল প্রক্রিয়ায় যে সকল মন্ত্র উচ্চারণ করা হয় সেগুলো অনুধাবন করলে পরিষ্কার বুঝতে পারা যায় যে আদিমকালের ভাষা থেকে সেগুলি গৃহীত হয়েছে। কতকগুলি মন্ত্র আমার "ফোক্ এলিমেন্টস্ ইন বেঙ্গলী লাইফ" গ্রন্থে দেওয়া আছে।

॥ আট ॥

এখনও বিপদসঙ্কুল জায়গায় যাবার জন্য লোক গুণিনের সাহায্য নেয়। যেমন সুন্দরবনের লোকেরা। সুন্দরবনের মানুষের প্রধান উপজীবিকা মাছ, কাঠ ও মধু। এই কারণে তাদের জঙ্গলে যেতে হয়। কিন্তু গুণিন ছাড়া তারা কখনও জঙ্গলে যায় না। গুণিনই প্রথম জঙ্গলের মাটিতে পা দেয় ও মন্ত্র উচ্চারণ করতে থাকে। মন্ত্রটা হচ্ছে– 'বনবিবি, ফুলবিবি, মাইবিবি ফতেমাবিবি/আমার মাল ছাড়া যদি যাও অন্য ঠাই/আর কি জানাই তোমায় ধর্মের দোহাই। আমার মালে উপরি বন্ধ, ফাঁপড়ি বন্ধ ডাকিনী যোগিনী বন্দ, ভূত-প্রেত দানা-দৈত্য বন্দ আমায় যে দেখাবি ভয়/সব অঙ্গ পোড়াব যা এই কয় কথায়।

গুণিন সঙ্গে থাকে, এবং তারা কখনও গুণিনের নির্দেশ ছাড়া জঙ্গলের কোনদিকে যায় না।

এই অধ্যায়ের উপসংহারে বলি– আদিম কাল থেকেই

মানুষ ধর্মের চেয়ে যাদুতেই বেশি বিশ্বাসী। তার কারণ, যাদুর মধ্যে কিছু বিজ্ঞান আছে, ধর্মের মধ্যে তা নেই। সেজন্য সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্বের প্রবক্তা ফ্রেজার তাঁর 'গোল্ডেন বাউ' গ্রন্থে বলেছেন– 'Magic is older than religion in the history of humanity, and belief in its efficacy is the universal faith, the truly Catholic creed'.

## কামনা, ব্রতানুষ্ঠান ও ধরনা

মানুষের কামনার অন্ত নেই। তাদের কামনাগুলোকে সার্থক করার জন্য বাঙলা দেশের কুমারী ও সধবা মেয়েরা নানা রকম ব্রতানুষ্ঠান, পূজাচারাদি ও দেবতার মন্দিরে ধরনা বা 'হত্যা' দেয়। ছোট ছোট মেয়েরা যে-সকল ব্রত করে, তাতে পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না। সেগুলো তারা নিজেরাই করে। সেগুলো সমাধা করতে গিয়ে যে সকল ছড়া উচ্চারণ করে তার ভিতর দিয়ে স্বতস্ফুর্তভাবে নিজেদের মনের বাসনা প্রকাশ করে। এ-রকম ছড়া উচ্চারণে তাদের অগাধ বিশ্বাস যে তাতেই তাদের মনের বাসনা পূর্ণ হবে। চৈত্র সংক্রান্তি থেকে বৈশাখ সংক্রান্তির মধ্যে তারা তিনটা ব্রত অনুষ্ঠান পালন করে। সে তিনটা ব্রত হচ্ছে শিবপূজা, পূণ্যিপুকুর ও দশপুতুলের ব্রত। শিবঠাকুরের ব্রত করবার জন্য তারা প্রত্যুষে উঠে স্নান করে খুব নিষ্ঠার সঙ্গে মাটি দিয়ে নিজ হাতে শিবের মূর্তি তৈরি করে 'শিল শিলেটন শিলেবাটন গৌরী আছেন ঘরে/গৌরী কি ব্রত করে' বলে ছড়া আরম্ভ করে এবং সমাধাতে বলে 'যেন শিবের মত স্বামী হয়।' পূণ্যিপুকুরের ব্রতে বলে– 'এ পূজলে কি হয়? নির্ধনীর ধন হয়। সাবিত্রীর সমান হয়। স্বামীর আদরিনী হয়। পুত্র দিয়ে স্বামীর কোলে। মরণ হয় যেন গঙ্গা জলে॥' আবার দশপুতুলের ব্রতে নিজের হাতে মাটি দিয়ে দশটা পুতুল গড়ে বলে– 'এবার মলে মানুষ হব। রামের মত পতি পাব॥ সীতার মত সতী হব। লক্ষ্মণের মত দেবর পাব॥ দশরথের মত শ্বশুর পাব। কৌশল্যার মত শাশুড়ী পাব॥ কুন্তীর মত পুত্রবতী হব। দ্রৌপদীর মত রাঁধুনী হব॥ দুর্গার মত সোহাগী হব। পৃথিবীর মত ভার সব॥ এবার মলে কি হব। ষষ্ঠীর মত জেঁওজ হব।" বলা বাহুল্য এ গুলোর ভিতর দিয়ে তাদের এক আদর্শ ও মহৎ জীবন যাপনের বাসনা প্রকাশ করে।

॥ দুই ॥

আদর্শ নারীজীবনে পুত্রবতী হবার বাসনা যে মাত্র কুমারীদের দ্বারা পালিত ব্রতসমূহের ভিতর দিয়ে প্রকাশ পায় তা নয়। সধবা স্ত্রীলোকদের নানারূপে পূজার্চনা ও ধরনা বা 'হত্যা' দেবার ভিতর দিয়েও প্রকাশ পায়। সেজন্য পুত্রকন্যার বিয়ের অব্যবহিত পরে সত্যনারায়ণ ও সুবচনী পূজা অনুষ্ঠিত হয়। কেননা বাঙালী সমাজে নিঃসন্তান ব্যক্তিকে সকলেই হেয় চক্ষে দেখে। সকলেরই ধারণা সকালে সেরূপ ব্যক্তির মুখ দেখলে দিনটা অত্যন্ত খারাপ যাবে। সেজন্য সন্তানবান ও পুত্রবতী হবার কামনা স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে সকলেরই মনে তীব্র আকারে প্রকটিত থাকে। এই কামনা নিয়েই বাঙালী মেয়েরা দেবস্থানে ধরনা বা 'হত্যা' দেয়। যে-সকল দেবতার স্থানে তারা ধরণা বা হত্যা দেয়, তার একটা পূর্ণ বিবরণ দিয়েছেন অধ্যাপক ডক্টর প্রদ্যোত কুমার মাইতি তাঁর 'বাঙলার লোকধর্ম ও উৎসব পরিচিতি' গ্রন্থে। সে-সব দেবতার মধ্যে তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন শিব, কালী, ষষ্ঠী, ধর্মঠাকুর, মনসা, মঙ্গলচণ্ডী, শীতলা, পঞ্চানন, রঙ্কিনী, বিভিন্ন পীর, বর্গভীমা, মা ডুমনী, বড়কুমার ইত্যাদি। এছাড়া তিনি কতকগুলো ব্রতেরও নাম করেছেন যথা– অশ্বত্থপাতা ব্রত, ইতুপূজা ব্রত, কলাছড়া ব্রত, কার্তিক ব্রত, কুক্কুটি ব্রত, চাঁপাচন্দন ব্রত, জয়মঙ্গলার ব্রত, জিতাষ্টমী, দুর্গাষষ্ঠী, পৃথ্বিপূজা, ফল গছানো ব্রত, মাঘমণ্ডল ব্রত, রালদুর্গার ব্রত, সঙ্কটমঙ্গলবারের ব্রত, সন্তান দ্বাদশী ব্রত ইত্যাদি।

॥ তিন ॥

কার্তিক ঠাকুরেরও পুত্রদানের ক্ষমতা বাঙালী সমাজে সুবিদিত। কার্তিক পূজায় যে মন্ত্রপাঠ করা হয়, তাতেও বলা হয়–

'কার্তিকেয়ং মহাভাগং ময়ুরোপরি সংস্থিতম।
তপ্ত কাঞ্চন বর্ণাভাম শক্তি হস্তং বর প্রদম্॥
দ্বিভূজং শত্রুহন্তারাং নানালঙ্কার ভূষিতম।
প্রসন্ন বদনং দেবং কুমারং পুত্রদায়কম॥

কার্তিক ঠাকুরের সন্তনদান করবার ক্ষমতা আছে, এই বিশ্বাসে আগেকার দিনে লোক কার্তিক পূজা করত। এখনও গ্রামাঞ্চলে বোধ হয়, এ বিশ্বাস বলবৎ আছে। সকালে নিঃসন্তান ব্যক্তির মুখ দেখা অশুভ বলে, আগেকার দিনে যারা কার্তিক পূজা করতে নারাজ থাকত, সেরূপ ব্যক্তির বাড়ি গ্রামবাসীরা রাত্রিকালে গোপনে তার বাড়িতে কার্তিক ঠাকুর রেখে আসত। ফলে সে ব্যক্তি বাধ্য হত কার্তিক পূজা করতে।

# বাঙালী জীবনের অস্তাচল

পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে পর্যন্ত বাঙালীর গৃহস্থালীতে ধামা, চুপড়ি, জাঁতা, কুলো, ধুনুচি, ঢেঁকি, হাতপাখা, হামানদিস্তা ইত্যাদি ব্যবহৃত হত। বাসন-কোসনের মধ্যে প্রভূত পাথরের ও কাঁসার বাসন ছিল। পিতলের বাসনও ছিল যেমন পিতলের ঘড়া, পিলসুজ, প্রদীপ, রেকাবি ইত্যাদি। মাটির উনুনে মাটির হাঁড়িতে ভাত-ডাল রান্না হত। রান্নাঘরে দুরকম উনুন থাকত– আমিষ ও বিধবাদের জন্য নিরামিষ রান্নার জন্য। এখন আর মাটির হাঁড়িকুড়িতে রান্না করা হয় না। বাসন-কোসনও পাথর-কাঁসা-পিতলের হয় না। অ্যালুমিনিয়াম ও স্টেনলেস্ স্টীল তাদের জায়গা দখল করেছে। রান্না-বান্নাও আর মাটির উনুনে হয় না। কেরোসিনের স্টোভ, 'জনতা', ইলেকট্রিক বা গ্যাস উনুনে রান্না হয়।

॥ দুই ॥

রান্না ভাত কাপড়ে ঠেকলে কাপড় 'সকড়ি' হয়ে যেত। আবার কাপড় বদলাতে হত। কোন জায়গা 'সকড়ি' হয়ে গেলে ন্যাতা-গোবর দিয়ে সে-জায়গাটা শুদ্ধ করা হত। লোক মেঝের ওপর আসন বা কাঠের পিঁড়ির ওপর বসে খেত। খাওয়া হয়ে গেলে ওই জায়গাটাও ন্যাতা-গোবর দিয়ে শুদ্ধ করে ফেলত। এখন 'সকড়ি' সংস্কার ও ন্যাতা-গোবর উঠে গেছে। এ-বেলার রান্না রেফরিজেটারে তুলে রাখা হয়, রাত্রে বা পরদিন খাবার জন্য। তাতে রেফরিজেরেটার 'সকড়ি' হয় না। এখন মানুষ মাটির ওপর আসন বা পিঁড়ি পেতে বসে খায় না। এখন চেয়ারে বসে টেবিলে খায়। এক্ষেত্রেও টেবিল

'সকড়ি' হয় না। তাছাড়া, মেয়েরা আর শিলনোড়া নিয়ে বাটনা বাটতে বসে না। এখন গুঁড়ো মশলাতেই কাজ সেরে ফেলে। একই উনুনে আমিষ ও নিরামিষ রান্না হয়। বিধবারা স্বচ্ছন্দে তা খায়। এক কথায় আগেকার দিনের শুচিতা ও সকড়ি সংস্কার এখন বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

॥ তিন ॥

লোকে আগে গামছা পরে গাড়ু হাতে করে পায়খানায় যেত। পায়খানা করবার পর গামছাটা কেচে ফেলত। এখন আর ওসব বালাই নেই। লোকে পরিহিত কাপড় পরেই পায়খানায় যায়। গাড়ুও বিলুপ্ত হয়ে গেছে। পায়খানা করবার পর 'হাতেমাটি' করার রীতিও এখন আর নেই। পায়খানায় গেলে কাপড় যে নোংরা ও অপবিত্র হয়ে যায়, এ-বোধ এখন আর নেই। অত্যন্ত ক্ষিপ্রগতিতে আমাদের ব্যবহারিক জীবনে এসব পরিবর্তন ঘটছে।

মেয়েরা আগে হাতে কাঁচের চুড়ি ও কপালে কাঁচপোকার টিপ পরতে ভালবাসত। এখন হাতে রিস্ট-ওয়াচ ও কপালে সিঁদুরের টিপ পরে। মেয়েদের পায়ে মল বা তোড়াও উঠে গেছে। মেয়েরা এখন আর বুক পর্যন্ত ঘোমটা দেয় না। আগে মেয়েরা পায়ে জুতা পরত না। এখন জুতা পায়ে দেওয়া মর্যাদার একটা চিহ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। অভিজাত ও মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েরা আগে পথে বেরত না। এখন তারা একা-একাই সিনেমা-থিয়েটার ও বাজার-হাটে যাচ্ছে। অনেকে আপিসেও যাচ্ছে চাকরির কারণে।

॥ চার ॥

বাড়ির ভেতরেরও অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। বাড়ির ভেতরে সেকালে মেয়েদের দুটো বড় কাজ ছিল— পান সাজা ও প্রদীপের সলতে পাকানো। এ-দুটোর কোনটাই এখন নেই। বাড়ির ভেতর মেয়েরা ঘোমটা দিয়ে ঘুরে বেড়াত। ভাশুর-শ্বশুর বা অন্য কোন গুরুজন সামনে এসে পড়লে সরে

দাঁড়াত। ভাশুর ও মামাশ্বশুরের সঙ্গে ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে গেলে 'ধান-সোনা' উৎসর্গ করতে হত। এখন মেয়েরা স্বচ্ছন্দে ভাশুর ও মামাশ্বশুরের সঙ্গে কথা বলে, একসঙ্গে বসে খায় ও গা ঘেঁষাঘেষি করে সিনেমা-থিয়েটারে বসে।

প্রতি বাড়িতেই একটা করে আঁতুর-ঘর থাকত। সেখানেই বাড়ির বৌ-ঝিরা প্রসব করত। মেয়েদের একমাস অশুদ্ধ বা অপবিত্র অবস্থায় আতুর ঘরে থাকতে হত। একুশ দিন বা একমাস পরে ষষ্ঠীপূজা না হওয়া পর্যন্ত শুদ্ধ হত না। এখন মেয়েরা হাসপাতাল বা নার্সিং হোমে প্রসব করে বলে ষেটেরা পূজা, চারকৌড়ে, আটকৌড়ে ইত্যাদি উঠে গেছে।

সেকালে কোন বাড়িতে ঝি-চাকর ঢুকলে, আজীবন তারা সেই বাড়িতেই থাকত এবং বাড়ির লোকেরা তার সঙ্গে আত্মীয়তা করে তাকে 'মাসী', 'দিদি' ইত্যাদি বলে সম্বোধন করত। এখন লোকে তাদের 'কাজের লোক' বলে এবং তাদের নাম ধরে ডাকে।

'হাতেখড়ি' না হলে সেকালে বিদ্যারম্ভ হত না। মেয়েরা পাঁচ থেকে আট বছর পর্যন্ত নানারকম ব্রতানুষ্ঠান করত। বিয়ের পর প্রথম রজঃদর্শনের সময় রজঃদর্শন উৎসব হত। এটা খুব সমারোহের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হত। গর্ভধারণের পর মেয়েদের তিনমাস, পাঁচমাস ও সাতমাসে 'সাধ' হত। এগুলোও খুব ঘটা করে অনুষ্ঠিত হত ও বৌদের বাপের বাড়ি থেকে 'তত্ত্ব' আসত।

## ॥ পাঁচ ॥

আগেকার দিনের মেয়েরা এখনকার দিনের মেয়েদের চেয়ে বেশি ধর্মপরায়ণা ছিল। সকালে উঠে তারা পঞ্চকন্যার নাম স্মরণ করত, ও সদর দরজা থেকে শুরু করে সমস্ত বাড়িতে গোবরজলের ছিটা দিত। এছাড়া, সন্ধ্যেবেলায় তুলসীমঞ্চে প্রদীপ জ্বেলে প্রণাম করত। এখনকার মেয়েরা সে-সময়টা রেষ্টুরেন্ট বা সিনেমায় কাটায়।

## ॥ ছয় ॥

এছাড়া, বাঙালীর ব্যবহারিক জীবনে আরও অনেক সংস্কার ছিল। সেকালের লোক ভিখারীকে কখনও ফিরিয়ে দিত না। তবে অশৌচকালে ভিক্ষা দেওয়া নিষিদ্ধ ছিল। ভিক্ষা দিতে গিয়ে মেয়েরা কখনও দু-চার কণা চাল মাটিতে ফেলত না। তাদের বিশ্বাস ছিল যে ভিক্ষার চাল মাটিতে পড়লে, সে কন্যাসন্তান প্রসবিণী হবে। সেকালে লোক সকালে কৃপণ বা নিঃসন্তান লোকের নাম করত না। তাদের বিশ্বাস ছিল যে ওরূপ লোকের নাম করলে সেদিন তাদের অন্ন জুটবে না। যাত্রার সময় কেউ হাঁচলে, সেটাকে অমঙ্গল জ্ঞান করত এবং পুনরায় ফিরে এসে অপেক্ষা করে তারপর যাত্রা করত। তাছাড়া, লোক বিশ্বাস করত যে বাঁ চোখ কাঁপা, বা বাঁ অঙ্গ যদি নাচে, তা হলে তার ক্ষতি হবে। অঙ্গে টিকটিকি পড়াতেও বিশ্বাস করত। আরও বিশ্বাস করত যে মঙ্গলবারে বৃষ্টি নামলে তিনদিন, আর শনিবারে নামলে সাতদিন বৃষ্টি হবে। খেতে খেতে 'বিষম' লাগলে বলত, কেউ তার নাম করছে। এছাড়া, বৃহস্পতিবারে কেউ লেনদেন করত না। বৃহস্পতিবারের বারবেলাটাও সব কাজে অশুভ বলে মনে করত। শনিবারে, মঙ্গলবারে ও জন্মবারে কখনও নববস্ত্র পরিধান করত না। জন্মবারে বা জন্মমাসে কোন ক্ষৌরকর্ম বা কেশকর্তন করত না। মেয়েরাও ছেলের জন্মবারে বা জন্মমাসে নূতন কাপড় 'ভাঙত' না বা নূতন হাঁড়ি 'কাড়তো' না। রাত্রিকালে মেয়েরা চুল বাঁধত না, বা সিঁদুর পরত না; কিংবা আয়নায় মুখ দেখত না। বলত, সেরূপ করলে কুলটা হতে হবে। দাঁড়কাক ডাকলে, সেটা খুব অমঙ্গলের লক্ষণ বলে মনে করত। দোকানীরা রাত্রে সূঁচ বেচত না। রাত্রে কালপেঁচা ডাকলে, সেটাকেও অমঙ্গলের লক্ষণ বলে মনে করত। এছাড়া, বারবেলা, কালবেলা ইত্যাদিতে কোন শুভকর্ম করত না। একাদশীতে সধবা মেয়েদের মাছ খাওয়া অবশ্য কর্তব্য ছিল। বিশ্বাস করত যে একাদশীতে মাছ না খেলে সে বিধবা হবে। ওইদিন মেয়েরা পায়ে আলতাও পরত। স্বামীর আগে মেয়েরা কখনও অন্নগ্রহণ করত না। স্বামী বা কোন গুরুজনের নাম উচ্চারণ করত না। নামের প্রথম বর্ণটা পরিবর্তন করে তাদের নাম করত। কেউ এক চোখ দেখালে লোকে ভাবত অপরের সঙ্গে ঝগড়া হবে। এর প্রতিকারার্থে তাকে দু'চোখ বন্ধ করে দেখাতে বলা হত।

বাঙালী জীবনের নৃতাত্ত্বিক রূপ

প্রাচীনকাল থেকে চলে আসা বাঙলার সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্বের বিভিন্ন উপাদান বর্তমান গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়। এর অন্তর্গত বহু উপাদানই আজ আর বাঙালী সমাজে প্রযোজ্য নয় বা সেগুলি হারিয়ে যাচ্ছে আধুনিক জীবনযাত্রার প্রভাবে। লেখক একদিকে যেমন সে সমস্ত উপাদানকে এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন, তেমনি স্বল্প পরিসরে তার নৃতাত্ত্বিক ব্যাখ্যাও প্রদান করেছেন।

বাঙলার নৃতত্ত্ব বিষয়ক গবেষণা ও আলোচনার ক্ষেত্রে ডঃ অতুল সুর একটি পরিচিত নাম। তাঁর বহু নৃতাত্ত্বিক গবেষণা বাঙালী সমাজকে নতুনভাবে ভাবতে শিখিয়েছে। লেখকের সেই প্রাজ্ঞতা ও মননশীলতা বর্তমান গ্রন্থেও সমীকৃত হয়েছে তাঁর রচনায়।

প্রচ্ছদ : শিবশঙ্কর ভট্টাচার্য

মূল্য : ২৫ টাকা

বেস্টবুক্‌স্

১এ কলেজ রো, কলিকাতা-৭০০০০৯

ISBN : 81-85252-45-9